একদা ক্রিকেট

মতি নন্দী



একদা ক্রিকেট

একদা ক্রিকেট

মতি নন্দী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ : ১৩৮২

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
গোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

ছ' টাকা

মুকুল দত্ত
সহৃদয়েষু

□ স্কোর বোর্ডের সীমার বাইরে □

ত্রিনিদাদের সি এল আর জেমস, ইতিহাস রাজনীতি ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং ক্রিকেটেও। লিয়ারি কন্সটাণ্টাইন সম্পর্কে কিছু জানবার জন্য বছর পাঁচেক আগে তিনি, লিয়ারির সমসাময়িক জর্জ হেডলির সঙ্গে যে আলাপ করেছিলেন তুলে দিচ্ছি ঃ

"জর্জ, এমন কোন ইনিংসের কথা কি তোমার মনে পড়ে যেটার কথা ভাবলে তুমি একটু বিশেষ ধরনের গর্ব বা খুশি বোধ কর?"

শুনে হেডলির মুখভাব এমন হয়ে গেল যেন তাকে জন্মদিনের কথা স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। "না, একটাও মনে পড়ে না। যেমন যেমন ইনিংসগুলো এসেছে তেমনিভাবেই খেলেছি।"

"একটার কথাও কি মনে পড়ে না জর্জ? লর্ডসে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কথাটাও নয়?"

"না।" আমাকে সাহায্য করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে মন্থর স্বরে হেডলি বললেন, "সত্যি বলতে কি বিশেষ করে কিছু মনে পড়ে না। অনেক ভাল ভাল ইনিংস দেখেছি বটে কিন্তু একটাকেও আলাদা করতে পারছি না।"

ঠিক করলাম ওকে কোণঠাসা করব।

"আচ্ছা তোমার খেলোয়াড় জীবনে এমন কোন ব্যাপার আছে কি, যেটাকে তুমি অবিস্মরণীয় বলে মনে কর?"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। শুধু উৎসাহিতই হয়ে উঠলেন না, উত্তেজিতও হলেন। "হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। যে ধরনের ফাস্ট বোলার হিসেবে লিয়ারিকে, জানতাম, সেই লিয়ারি ১৯৩৯-এ স্টাইল

বদলে স্লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝি হয়ে কিভাবে তাঁর আগের ফাস্ট বোলিংয়ের কার্যকারিতা বজায় রেখেছিল, সেটা মনে পড়ে। ক্রিকেটের কথা ভাবলে এই ব্যাপারটাই আমার সব থেকে বেশি মনে পড়ে।"

জেমস বুদ্ধিমানের মতই প্রসঙ্গের ছেদ এখানেই টেনেছিলেন। কিন্তু অসাধারণ এক ব্যাটসম্যানের চরিত্রের দুর্বোধ্য একটা অংশ এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়ে গেল। সেই দুর্বোধ্য দিকটাকে ভোঁতামি না উদাসীনতা না হাস্যকরতা, কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

১৯৬৯ নভেম্বরের মাঝামাঝি এমট রবিনসন মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৭। ইয়র্কশায়ারের মাঝারি ধরনের ক্রিকেটার ছিলেন। মরশুমে ৭০০ রান ও ৭০ উইকেট পর্যন্ত বড়জোর পৌঁছতেন। কিন্তু নেভিল কার্ডাস, রবিনসনকে অসাধারণ করে রেখেছেন ওঁর চরিত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্য।

ইয়র্কশায়ার একাদশে রবিনসনের না থাকা, হ্যামলেট নাটকে —না, ডেনমার্কের যুবরাজ নয়, প্রথম গ্রেভডিগারের না থাকারই সমান। নতুন বলে ওপেন করতেন রবিনসন। ওভার শেষে দু হাতের অঞ্জলিতে ঝকঝকে বলটিকে পবিত্র বস্তুর মত ধরে অপর প্রান্তে গিয়ে বোলারের হাতে তুলে দিতেন। ভ্রমক্রমে কেউ (অবশ্যই নবাগত কোন নির্বোধ) বলটি গড়িয়ে দিলে আর রক্ষে ছিল না। রবিনসন মাঠের মাঝেই তার বাপান্ত করে ছাড়তেন।

বাৎসরিক ল্যাঙ্কাশায়ার-ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ম্যাচ ওই দুই কাউন্টির অধিবাসীদের জীবন-মরণ সংগ্রাম। একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই দুইদল মাঠে নামে—যেন হেরে না যাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোন পক্ষ লাঞ্চের আগে চার মারত না এবং পরেও যতটা সম্ভব কম মারা—এটাই ছিল অঘোষিত নীতি। বিলম্বিত লয় শুধু রাগরাগিনীতেই নেই ক্রিকেটেও যে আছে সেটা বিশেষ করে বোঝা

যায় এই খেলাটিতে। নমুনা স্বরূপ কার্ডাস বলছেন, "১৯২১-এর জুনে খেলা শুরু করতে নামলেন হ্যালোজ ও মেকপীস। আমিও তখন ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ম্যাঞ্চেস্টারে এলাম এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে, সস্ত্রীক আবার ওলড ট্রাফোর্ডে ফিরে দেখি ইতিমধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের রান উঠেছে সতেরো। মেকপীস ৫, হ্যালোজ ১১ এবং একটি লেগবাই।" বহু ব্যাটসম্যান আছে যারা দ্রুত রান তুলতে পারেনা যেহেতু তারা অক্ষম। বহু ব্যাটসম্যান আছে যারা দ্রুত রান করতে পারে কিন্তু তারা কিছুতেই যে করবেনা সেটা এই খেলাতেই দেখা যায়। চার মারুক চাই নামারুক, রান হোক চাই নাহোক, ল্যাঙ্কাশায়ার বনাম ইয়র্কশায়ার ম্যাচে খেলোয়াড়রা, আচরণ ও কথার মধ্যে দিয়েই গম্ভীর আবরণে ঢাকা তাদের চরিত্রের যে হাস্যকর দিকটিকে তুলে ধরে তাতেই এই খেলা মহনীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এমট রবিনসন ছিলেন এদেরই মুখ্য প্রতিনিধি।

গোলাপের এই যুদ্ধে একবার ইয়র্কশায়ার হারের মুখে। ব্যাট করছেন উইলফ্রেড রোডস ও রবিনসন। শেষ জুটি ওরা। কোন ক্রমে সময় কাবার করে দিলেই খেলা ড্র হবে। রবিনসন হঠাৎ লেট কাট করে বসলেন অফ স্টাম্পের বাইরের একটি বল। বল দ্রুত যাচ্ছে থার্ডম্যানের দিকে আর রবিনসন মুগ্ধ হয়ে আপন সৃষ্ট এই অনুপম শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে। বিশ্বাসই করতে পারছেন না তিনি এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছেন। ওদিকে রোডস ছুটে এসেছেন রান নেবার জন্য। কিন্তু রবিনসন তখনও ভাবে বিভোর। চট্‌কা ভেঙ্গে যখন নির্দয় বাস্তবে ফিরে এলেন তখন রোডস রান আউট। ইয়র্কশায়ারও 'সনাতন শত্রুর' হাতে পরাজিত। বহু বছর পরও রবিনসন বলতেন, "আমি! আশ্চর্য, আমিই কিনা এই ফ্যান্সি কাট্‌ করলাম!"

এ খেলায় মেডেন ওভার হত ঝুড়ি ঝুড়ি। মাঠের মাঝে জীবনের

স্পন্দন আছে কিনা, একমাত্র হঠাৎ ডাকা লেগ বিফোর উইকেট আবেদনের মারফৎ সেটা জানা যেত। কার্ডাস বলছেন, প্রায়ই ভাবতাম, ওভার শেষে ফিল্ড যখন স্থান পরিবর্তনে ব্যস্ত, কেউ হয় তো তখন আউটফিল্ড থেকে বল ছুঁড়ল আর বলটি দৈবক্রমে ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগল, তাহলে নিশ্চয়ই এগারো কণ্ঠে বিকট "হা'জ্যাট্‌স" চীৎকার উঠবে, নিছকই অভ্যাসের দরুণ।

এমট রবিনসনকে নিয়ে কার্ডাস অনেক গল্প করেছেন। একবার লর্ডসে ইয়র্কশায়ার শনিবার খেলা শুরু করে প্রথমদিন তিনশোরও বেশি রান করল। রবিবার খেলা বন্ধ। সেদিন সকালে, তুমুল জল-ঝড় হয়ে বিকেলে খটখটে রোদ উঠল। হাইড পার্কে বেড়াতে বেড়াতে কার্ডাসের সঙ্গে দেখা হল রোডস ও রবিনসনের। "চমৎকার বিকেল, তাই না ?" কার্ডাস বললেন। "হ্যাঁ" রবিনসন সখেদে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আর লর্ডসে একটা চমৎকার স্টিকি উইকেট নষ্ট হচ্ছে।" আর একবার, খেলার আগে বৃষ্টি হয়েছে। রোডস ও রবিনসন মাঠে গেলেন পীচ পরীক্ষা করতে (মাঠে অপেশাদার অধিনায়কের ভূমিকা ছিল ঠুঁটো জগন্নাথের)। অনুমতি নিয়ে কার্ডাসও ওদের সঙ্গী হলেন। কার্ডাস শুনলেন, আঙুল দিয়ে মাটি টিপতে টিপতে চিন্তিত স্বরে রোডস বলছেন, "এমট, আমার মনে হচ্ছে চারটে নাগাদ শুকবে।" তার থেকেও উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রবিনসন বললেন, "উঁহু, মনে হচ্ছে সাড়ে চারটেয়।"

রবিনসন সম্পর্কে সেরা গল্পটি বলেছেন ফাস্ট বোলার বিল বাওয়েস। হেডাল ভেরিটি আর বাওয়েস তখন সবে ইয়র্কশায়ার প্রথম একাদশে স্থান পেয়েছেন। হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে খেলায় ভেরিটি পেলেন ২৬ রানে সাত উইকেট আর বাওয়েস ৪৫ রানে দুই উইকেট। খেলার পর দুজনে সিনেমা দেখে রাত্রে হোটেলে ফিরছে, দেখে হোটেলের দরজায় পায়চারী করছেন রবিনসন ও রোডস। রবিনসন বললেন, "এই যে ফিরেছ দেখছি। ঘরে

চলো।" শুনেই ধড়াস করে উঠল বাওয়েসের বুক। প্রতিদিনের খেলার পর রাত্রে, সেদিনের খেলার পর্যালোচনা করেন রোডস ও রবিনসন। মাঠের ভুলত্রুটি নিয়ে অপরাধী খেলোয়াড়কে রগড়ানি দেওয়াই এক্ষেত্রে পর্যালোচনা! বাওয়েস বুঝলেন আজ তার দফারফা হবে যেহেতু, ৪৫ রানে দুটি উইকেট! ২৬ রানে সাত উইকেট পাওয়া ভেরিটি মুচকিমু চকি হাসলেন।

ঘরে এসে রবিনসন বিছানাটাকে ক্রিকেট মাঠ বানালেন। সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চিরুণি প্রভৃতি দিয়ে ফিল্ড সাজিয়ে, তাকালেন ভেরিটির দিকে। "বলো আজ তুমি কি করেছ?"

বুকটা একটু ফুলিয়ে, উদ্ভাসিত মুখে ভেরিটি বললেন, "ছাব্বিশ রানে সাতটি উইকেট পেয়েছি।"

"ছাব্বিশ রানে!" বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন এমট রবিনসন। "বাইশ রানে হল না কেন? ফিফথ ওভারের ফোর্থ বলটা তুমি শর্ট পীচ ফেলেছিলে; ব্যাটসম্যান এইখানে মেরে (ডীপ ফাইন লেগে টুথব্রাশ রাখলেন) চারটে রান করে। কেন করবে? কেন বাইশ রানে সাত উইকেট হবে না? বাবুগিরি করে বোলার হবে ভেবেছ?"

একবার একটি ডিনারে কার্ডাস ও রবিনসন পাশাপাশি বসেছেন। রবিনসন ফিসফিস করে বললেন, "মনে আছে ডিক ওয়াডিংটন কি ভাবে খেলার শেষ ওভারে স্টাম্প আউট হয়? লাস্ট ব্যাটসম্যান ....শেষ ওভারে....স্টাম্প আউট? আমি হলে মরে যেতুম, আত্মহত্যা করতুম।" বলেই উত্তেজনায় টেবলে ঘুঁষি মেরে গ্লাস, প্লেট, কাঁটা-চামচ ঝনঝনালেন। ওয়াডিংটন আউট হয়েছিল আট বছর আগে। কিন্তু ক্রিকেটকে রবিনসন, নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, আউট হওয়া আর মৃত্যু সমান হয়ে গেছল তার কাছে। এমন তীব্রভাবে ক্রিকেটকে খুব কম লোকই ভালবেসেছেন।

রবিনসনের ঠিক উল্টো চরিত্রের ছিলেন নটিংহামের জর্জ গান। তার জীবন দর্শনের সারাংশ হল—"কি মাঠের মধ্যে কি বাইরে, তাড়াহুড়ো করার কি আছে!" এবং তিনি কদাচ এই বাক্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। রবিবার খেলা বন্ধ থেকে সোমবার আবার শুরু। গানকে সকালে জাগিয়ে চা দিয়ে ওর স্ত্রী নীচে নেমে এসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হলেন। অনেকক্ষন কেটে গেল কিন্তু জর্জ আর নামে না। ওর স্ত্রী আবার উপরে এসে দেখেন জর্জ অঘোরে ঘুমচ্ছে। জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "জর্জ ওঠো দশটা প্রায় বাজে। খেলা রয়েছে, মাঠে যাবে কখন?" গান ঘুমজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আরে ব্যস্ত হবার কি আছে, অন্তত এক ঘণ্টার আগে স্কিপার ডিক্লেয়ার করছে না।" তখন গান-গৃহিণী ওকে মনে করিয়ে দিলেন, "কিন্তু তুমি যে নট আউট রয়েছ শনিবার থেকে, তোমাকেই তো গিয়ে প্রথমে ব্যাট করতে হবে।" জর্জ গান ভুলে গেছলেন যে, শনিবার থেকে তিনি ৭২ নট আউট আছেন।

নিস্পৃহ জর্জ গান কি সবসময়ই এই রকম? নিশ্চয় নয়। তাহলে ১৯০২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত খেলে ৩৫,১৯০ রান ও ৬২টি সেঞ্চুরী করতে পারতেন না বা প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে (১৯০৭-০৮ সিডনী) ১১৯ করাও সম্ভব হত না। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে প্রতিভাধরদের চরিত্র বোঝান যায় না। একদিন তাঁর অধিনায়ক আর্থার কার চমৎকার উইকেটে টসে হারলেন ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে। খেলায় তার কয়েকজন বোলার আঘাত পেয়ে আহত হলেন। নটিং-হাম ব্যাট করতে নামার আগে কার এসে গানকে বললেন, "জর্জ আমি চাই, টি পর্যন্ত একধারের উইকেটে তুমি থাকো। অন্তত ৪০০ রান আমাদের দরকার।" কিন্তু গান জানালেন, বয়স হয়ে গেছে তাঁর, "অতক্ষণ দাঁড়াবার সামর্থ আমার পায়ে নেই।" কিন্তু কার নাছোড়বান্দা। গানও আবার শুরু করলেন তাঁর সওয়াল এবং শেষমেশ বললেন, "বেশ মিঃ কার তাহলে যতক্ষণ খেলব ঘণ্টা পিছু

এক পাউণ্ড করে দেবেন বলুন?" অনন্যোপায় আর্থার কারকে অবশেষে তাতেই রাজি হতে হল। সেদিন জর্জ গান পাঁচ ঘণ্টায় ৪০ রান করে, কারের কাছ থেকে শুধু প্রাপ্য অর্থই সংগ্রহ করেননি দেড়ঘণ্টা বেশি খেলার জন্য ওভারটাইমও আদায় করেন।

১৯০৭-এর ডিসেম্বরে, সিডনীতে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে গান একটি বাউণ্ডারী করেছিলেন, বাঁ পা তুলে পায়ের তলা দিয়ে বল মেরে। এ খেলায় দু ইনিংসে করেন ১১৯ ও ৭৪। গান যখন সেঞ্চুরীর পথে তখন মাঠের ধারে ব্যাণ্ডে 'গিলবার্ট ও সুলিভান' এর সুর বাজান হচ্ছে। ট্রাম্পেটটা বেসুরে বাজছিল। গান পরে বলেন, "আমি তখন গুন গুন করে গাইছি 'রেগুলার রয়্যাল কুইন' আর সেই সঙ্গে ওয়ারউইক আর্মস্ট্রংয়ের টপ স্পিনারের উপরও নজর রাখছি। কিন্তু সব থেকে জ্বালাতন করছিল ওই বেসুরো ট্রাম্পেটটা।" এবং জ্বালাতন হতে হতে গান প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন,—কটার (ঘূর্ণিঝড়ের মত ফাস্ট বোলার), সণ্ডার্স, হ্যাজলিট, আর্মস্ট্রং, ম্যাকার্টনি এবং মন্টি নোবলের বিরুদ্ধে।

নিঃসন্দেহে জিনিয়াস। অবশ্য জিনিয়াস বলতে যদি বোঝায় সেই টেকনিক, যার মারফৎ মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম এবং যা নিজের মেজাজ বা ইচ্ছাকে খেলাবার সুযোগ দিতে পারে। একবার ট্রেন্টব্রিজে ইয়র্কশায়ার ৪৭১ রান করল টসে জিতে। ড্র করা ছাড়া নটিংহামের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, তাই জর্জ গান ছ'ঘণ্টা ধরে খুটখুট করে ১৩২ রান করলেন। ইয়র্কশায়ার বোলাররা ছিলেন—হার্স্ট, রোডস, বুথ, ড্রেক, হেই ও কিলনার অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের টেস্ট বোলিং। ইনিংস শেষে ওরা গানকে বিদ্রূপ করে বললেন, "কি হে তোমার স্ট্রোক গেল কোথায়, ভুলে মেরে দিয়েছ সব?" জর্জ শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "ওহ্, তোমরা স্ট্রোক দেখতে চাও বুঝি? দেখি তাহলে পরের ইনিংসে কিছু করা যায় কিনা।"

দ্বিতীয় ইনিংসে নটিংহাম ৯০ মিনিট ব্যাট করে। এর

স্কোরাকার্ডটি আজও ট্রেণ্ট ব্রিজে সিল্কের কাপড়ে লিখে রেখে দেওয়া আছে। সেটা এই রকম :—

জি, গান নট আউট	১০৯
জি লী ব হেই	৪
জে, হার্ডস্টাফ রান আউট	৩
জে, গান রান আউট	৮
ই, অ্যালেটসন ক বুথ ব রোডস	০
অতিরিক্ত	৫
মোট (৪ উইঃ)	১২৯

১৯৩২-এ জর্জ গান ক্রিকেট থেকে বিদায় নেন, আলফ গোভারের একটি ফাস্ট ফুলটস মাথায় লাগিয়ে। তখন ওর বয়স তিপ্পান্ন। অথচ গান সব থেকে ভালবাসতেন ফাস্ট বোলিং। অস্ট্রেলিয়ার 'প্রিন্স অব ফাস্ট বোলারস' টেড ম্যাকডোনাল্ড ল্যাঙ্কাশায়ারে যখন খেলতেন, গান ভেবেচিন্তেই ক্রীজ থেকে হেঁটে বেরিয়ে এসে ওর বিদ্যুৎগতির বল মেরেছেন। ম্যাকডোনাল্ড কখনো মাথা গরম করতেন না। কিন্তু একবারই করেছিলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ডের, শুকনো দুর্দান্ত ফাস্ট পীচে জর্জ গান ক্রীজ থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এসে ম্যাকডোনাল্ডের লাফিয়ে ওঠা বলগুলো স্লিপের মাথার উপর দিয়ে ইচ্ছে করেই তুলে দিচ্ছিলেন। একটা বল তো থার্ডম্যানের মাথার উপর দিয়ে প্রায় ওভার বাউণ্ডারীই হয়ে যাচ্ছিল। ম্যাকডোনাল্ড অনেকক্ষণ সহ্য করেছিলেন গানের ঔদ্ধত্য, এবার আর সামলাতে পারলেন না। হাজার হোক তারও তো মর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে। এভাবে অবহেলায় এবং উদ্ভট ভঙ্গিতে তার সঙ্গে আচারণ করলে মানসম্মান আর থাকে কোথায়? বাউণ্ডারী থেকে বলটা ফেরৎ আসার আগে তিনি চেঁচিয়ে গানকে বললেন, "জর্জ, ক্রীজে ফিরে যাও, নয়তো মুণ্ডু উড়িয়ে

দেব।" তাইতে গান, সেই আমলের সব থেকে দ্রুত বোলারকে জবাব দিলেন, "টেড, রাইস পুডিংয়ের সর তুমি উড়িয়ে দিতে পারবে না।"

ঔদ্ধত্য, নিস্পৃহতা, আর মিটমিটে বদমাইসির আড়ালে সর্বাংশে পেশাদার জজ গান, ক্রিকেটের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে রয়েছেন। এরই পাশাপাশি রাজসিক চালচলনে, মানসিক আভিজাত্যে ভরপুর ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক আর্চি ম্যাকলারেনকে রেখে দেখা যেতে পারে। কার্ডাস ওকে বলেছেন বটে 'দি নোবলেস্ট রোমান' কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে ব্রুটাসের থেকেও ম্যাকলারেন অনেক বেশি কাছের ছিলেন, সম্রাট সুপারবাসের। টোগার মত ওর অঙ্গে 'ক্লাসিক' বিশেষণটিকে মানাত। ব্যাটিং ভঙ্গি গর্বিত, সাড়ম্বর। বোলারদের মনে করতেন দাসানুদাস। চলাফেরায় বিচ্ছুরিত হত বনেদিয়ানা। ১৮৯৫-এ তেইশ বছর বয়সে সমারসেটের বিরুদ্ধে ৪২৪ করে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের যে বিশ্ব রেকর্ড তিনি করেছিলেন, সেটি ২৮ বছর পর ভাঙ্গেন অস্ট্রেলিয়ার বিল পন্সফোর্ড এবং আজও কোন ইংরেজ ব্যাটসম্যান এর ধারে কাছে আসতে পারেনি।

ম্যাকলারেন ইংল্যাণ্ড দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া অভিযানে গেছলেন ১৯০১-০২ মরশুমে। সিডনী টেস্টে টসে জিতে ওপেন করতে নামলেন টম হেওয়ার্ডকে নিয়ে। শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন এমন ভঙ্গিতে ক্রীজে পৌঁছলেন। রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে অনুগ্রহপূর্বক নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে আম্পায়ারকে বললেন, "টু লেগ, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড।" স্টাম্প থেকে একটি বেল তুলে নিয়ে ক্রীজে আঁচড় কেটে, ধীরে-সুস্থে বেলটি যথাস্থানে রাখলেন। এদিকে অস্ট্রেলীয় দল ততক্ষণ অপেক্ষারত। অতঃপর সীজরীয় দৃষ্টিতে তিনি মাঠে ফিল্ডারদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলেন। লেগের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে জো ডার্লিং তিনজনকে রেখেছেন। দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত হল ম্যাকলারেনের।

"জো, এ-সবের মানে কি ?"

"কী সবের মানে, আর্চি ?"

"কিজন্য", ম্যাকলারেন ব্যাট তুলে লেগ সাইডের তিন ফিল্ডস ম্যানের দিকে নির্দেশ করে বললেন, "কিজন্য এই লোকগুলো এখানে রয়েছে ?"

"তোমার জন্য, আমার এই ফিল্ড।" ডার্লিং উত্তর দিলেন। ম্যাকলারেন বিরক্ত হয়ে ওদের দিকে আবার ব্যাট তুলে বললেন "জো, এদের সরিয়ে নাও।"

"কাকে সরিয়ে নেব ?" ডার্লিং জানতে চাইলেন।

"আমি কি বোঝাতে চাইছি, জো, সেটা তুমি ভালভাবেই জান। প্লিজ ওদের সরিয়ে নাও।"

কিন্তু ডার্লিংও অনড়ঃ "আর্চি, আমার ইচ্ছামত নিশ্চয় আমি ফিল্ড সাজাতে পারি। এবার খেলা শুরু কর।"

"জো, ওদের সরিয়ে নাও বলছি", ম্যাকলারেন অবিচল ধৈর্যে আবার বললেন। "হাউ ডু য়্যু এক্সপেক্ট মী টু মেক মাই সেলিব্রেটেড হুক-স্ট্রোক ইফ দিজ ড্যামড সিলি পিপল গেট ইন মাই ওয়ে ?"

এ কথা কাউড্রি বলছে বিল লরীকে বা পতৌদি সোবার্সকে কেউ স্বপ্নেও কি শোনার চেষ্টা করতে পারেন ? কিন্তু তখন ক্রিকেট স্বর্ণমহিমার মধ্যাহ্নে। ক্রিকেট তখন চরিত্রের মিছিলে বিচিত্র। তখন এক ইনিংস খেলা হত একটি বল দিয়েই। 'সায়েন্টিফিক ক্রিকেট', শব্দটি তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বিরক্তিকর, একঘেঁয়ে, যন্ত্রবৎ মিডিয়াম পেসাররা তখনো ক্রিকেট খেলা দেখাকে যন্ত্রণাকর করে তোলেনি। ম্যাকলারেন সেই আমলেরই এক বিশাল চরিত্র। জো ডার্লিং লেগ সাইডের তিনটি লোককে অবশ্যই সরিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা, টাইসনতুল্য গতির আর্নেস্ট জোন্সের তিনটি বলকে ম্যাক-লারেন পর পর স্ট্রেট ড্রাইভ করে বাউণ্ডারীতে পাঠাতেই ডার্লিং

তাদের সরিয়ে বোলারের পিছনে বাউণ্ডারী ঘেঁষে মোতায়েন করাতে বাধ্য হন। ম্যাকলারেন তখন বিপক্ষ অধিনায়ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এবার আমরা তাহলে ভদ্রলোকের মত খেলা চালাতে পারব।"

অস্তে যাবার বহু বছর পর আর্চি ম্যাকলারেন এসেছেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে একটি টেস্ট ম্যাচ দেখতে। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। তিনি এক চায়ের স্টলের প্রবেশ পথে আশ্রয় নিলেন। ল্যাঙ্কাশায়ার মাঠে ল্যাঙ্কাশায়ারেরই প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রাক্তন অধিনায়ককে এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলেন নেভিল কার্ডাস। বললেন "প্যাভিলিয়নে গিয়ে হোমরাচোমরাদের সঙ্গে বসুন।"

"না না, আমি ঠিকই আছি এখানে।" ব্যস্ত হয়ে ম্যাকলারেন বললেন, "আমি তো আমন্ত্রণপত্র পাইনি বোধহয় ডাকের গোলমাল হয়েছে!" এই সময় ভিতর থেকে এক ওয়েট্রেস ন্যাপকিন ঢাকা একটি ট্রে হাতে বেরোল। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে মহিলা এনক্লোজারে চা নিয়ে তাকে যেতে হবে। ম্যাকলারেন মেয়েটিকে থামিয়ে নিজের অঙ্গ থেকে রেনকোটটি খুলে পরিয়ে দিলেন। তারপর ওকে চলে যাবার জন্য হাত নেড়ে নির্দেশ দিয়ে কার্ডাসের দিকে ফিরলেন, "নাউ, মাইডিয়ার...."

ম্যাকলারেনের নাম মনে পড়লেই ওর সমসাময়িক দুজন অস্ট্রেলীয়র নামও আমার মনে পড়ে। ভিক্টর ট্রাম্পার আর ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেই ১৯০২-এর প্রথম টেস্ট ম্যাচে ট্রাম্পার প্রথম দিন লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি ১০৪) করেন অস্ট্রেলিয়া ১৭৩-১)। মেঘলা সকাল, উইকেট ভিজে, বহির্মাঠ ভারী, তাই টসে জিতেও ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠান। দলের প্রতি ওর একটিই নির্দেশ ছিল—"কীপ্ ভিক্টর কোয়ায়েট্।" কেননা, "লাঞ্চের পর উইকেট স্টিকি হয়ে উঠবে তখন আমরা চটপট ওদের শেষ করে

দিতে পারব। লাঞ্চ পর্যন্ত যদি ওদের আশির মধ্যে রাখতে পারি তাহলে এই ম্যাচ, এবং রাবারও আমরা জিতে গেছি। সুতরাং যেভাবেই হোক, ভিক্টরকে চুপ করিয়ে রাখতে হবে।" ইংল্যাণ্ডের সূক্ষ্মতম বুদ্ধিসম্পন্ন সর্বাধিক রাজকীয় অধিনায়ক তার যাবতীয় কৌশল নিয়োজিত করলেন ভিক্টর ট্রাম্পারকে পঙ্গু করে রাখার জন্য। উইলফ্রেড রোডস, স্ট্যানলি জ্যাকসন, জ্যাক ব্রণ্ড ও ফ্রেড টেটের মত লেংথ বোলারদের জন্যও বাউণ্ডারীর ধারে লোক রাখলেন, চার বাঁচাতে।

কিন্তু ট্রাম্পারকে 'চুপ' করান গেল না। দিনের তৃতীয় ওভারেই বোলারের পিছনে স্ক্রীনের বহু উপর দিয়ে দুটি বল পাঠালেন প্র্যাকটিস গ্রাউণ্ডে। বহু বছর পর ম্যাকলারেন বলেন, 'প্র্যাকটিশ গ্রাউণ্ডে তো আর আমি ফিল্ডার রাখতে পারি না।'

সারল্যে, বিনয়ে, মমতায় ভিক্টর ট্রাম্পার অসাধারণ চরিত্র। ইংল্যাণ্ডে ১৯০২-এর ভিজে মরশুমে, রোডস, বার্নেস, ব্লাইথ, হিয়ার্ন প্রমুখদের বিরুদ্ধে ২,৫৭০ রান করেছিলেন। ব্র্যাডম্যান আর নিউজিল্যাণ্ডের সাটক্লিফ ছাড়া সফরকারী কোন ব্যাটসম্যান ইংল্যাণ্ডে এত রান আজও করতে পারেননি। ট্রাম্পার যদি লোভী হতেন তাহলে এই সফরে অনায়াসে চার হাজার রান করতে পারতেন। ১১ টি সেঞ্চুরী করেছিলেন (১২৮ সর্বোচ্চ) কিন্তু ইচ্ছে করলেই সেগুলিকে ডাবল সেঞ্চুরীতে পরিণত করতে পারতেন। করেননি, যেহেতু তাঁর চরিত্রে এই ইচ্ছাটা বলবান নয়। সেঞ্চুরী পূর্ণ হলেই দেখতেন মাঠের তরুণতম খেলোয়াড় বা দুর্ভাগ্যতম বোলারটি কোনজন? অতঃপর তার হাতে নিজের উইকেট দান করে ফিরে আসতেন।

সিডনীতে খেলার সরঞ্জামের দোকান ছিল ট্রাম্পারের। ১৯০৩-০৪ মরশুমে টেস্ট খেলার দিন সকালে দোকানে কাজ করতে করতে তিনি ভুলেই গেছলেন খেলাটির কথা। খেয়াল হতেই দেখেন আর

সময় নেই। তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চাপিয়ে হাত বাড়িয়ে দোকানের তাক্ থেকে একটা নতুন ব্যাট তুলে নিলেন। ট্যাক্সি ধরে সিডনী মাঠে পৌঁছে করলেন ১৮৫ নট আউট। এইটাই নাকি তাঁর ৩৮ বছরের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস।

খেলার কিছুদিন পর ট্রাম্পারের এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁর দোকানে এসে ট্রাম্পার-ব্যবহৃত একটি ব্যাট কিনতে চাইল। ট্রাম্পার জানালেন, সন্থ টেস্টে যে ব্যাটটি দিয়ে খেলেছেন সেটি আছে। শুনেই ভক্তটির চোখ চকচক করে উঠল। কত দাম পড়বে? অনেক ভেবেচিন্তে সরল ব্যবসায়বুদ্ধিবর্জিত দোকানদার ভয়ে ভয়ে বললেন, "নতুনের দাম ৪৫ শিলিং, কিন্তু এখন তো ওটা পুরনো হয়ে গেছে। এক পাউণ্ড দাম পড়বে।"

এখনকার কোনো ক্রিকেটার ওই রকম একটি ইনিংস খেললে (যা একদমই অসম্ভব) সেই ব্যাটটির জন্য কত দাম চাইবেন? ওভার বাউণ্ডারী মেরে ট্রাম্পার সিডনী মাঠের কিনারে একটি বাড়ির জানলা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ট্রাম্পারের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর সেই জানলাটি নীলামে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

আর একবার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ১৯১০-১১ মরশুমে মেলবোর্ন টেস্টে খেলার আগে ড্রেসিং-রুমের দরজায় খুটখুট শব্দ হল— মিঃ ট্রাম্পার কি দেখা করবেন? ট্রাম্পার গিয়ে দেখেন একটি অপরিচিত তরুণ দাঁড়িয়ে, হাতে ক্রিকেট ব্যাট। তরুণটি ব্যাট তৈরীর ব্যবসায়ে নেমেছে। এই ব্যাটটি তারই অন্যতম। মিঃ ট্রাম্পার যদি এই ব্যাটে টেস্ট খেলেন তাহলে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন হিসাবে সেটাকে সে কাজ লাগাতে পারবে। শুনেই ট্রাম্পার রাজি হয়ে গেলেন। প্রায় সাড়ে তিন পাউণ্ড ওজনের ভারী সেই ব্যাটটি দেখে অন্যান্য অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়দের চোখ তো ছানাবড়া। একজন বলল, 'ভিক নিশ্চয় তুমি এই গদাটি নিয়ে খেলেছ না?'

'অল্পবয়সী ছেলে, সবে ব্যবসা শুরু করেছে', ট্রাম্পার কাঁচুমাচু

হয়ে বললেন, 'ব্যাটটা দিয়ে কিছু রান করলে ছেলেটির যদি উপকার হয়—'। এবং সেই ব্যাটে ৮৭ রান করে (বোধহয় তুলতে তুলতে হাঁপিয়ে পড়েই) ব্যাটটির পিছনে প্রভূত প্রশংসা লিখে সই করে তরুণটিকে ফিরিয়ে দিলেন।

ট্রাম্পারের বিপরীত চরিত্র ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং। ১৯২১-এ অস্ট্রেলীয় দল নিয়ে গিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যান ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায়। সিরিজ জেতেন ৩-০। দিশাহারা ইংল্যাণ্ড পাঁচটি টেস্টে ২৯ জনকে খেলিয়েছিল। কিন্তু আর্মস্ট্রং অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরেছিলেন অপোগণ্ড অ্যামেচারদের নিয়ে গড়া 'জেণ্টলমেন্ অফ ইংল্যাণ্ড'-এর কাছে। এ দলে বয়স্ক ছিলেন দুজন—দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত অলরাউণ্ডার অব্রে ফকনার তখন বয়স ৪০, আর অধিনায়ক আর্চি ম্যাকলারেন, তখন বয়স পঞ্চাশ থেকে চার মাস দূরে। ২৮ রানে আর্মস্ট্রংয়ের দুর্দান্ত দল হেরেছিল। ইংল্যাণ্ডের বড় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানেই (এখন 'গার্ডিয়ান') এই ম্যাচের বিবরণ বেরিয়েছিল কেননা নেভিল কার্ডাস ইস্টবোর্নের এই খেলা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেনে তাঁর বার্তা সম্পাদকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কার্ডাসের সাংবাদিক জীবনে এইটিই একমাত্র 'স্কুপ'!

আর্মস্ট্রং ভালবাসতেন লোককে ক্ষেপিয়ে ঝগড়া করতে। ১৯২১-এ কেন্টের সঙ্গে খেলায় প্রথম ইনিংসে প্রায় ৫০০ রানে এগিয়ে থেকেও তিনি কেন্টকে ফলো-অন করাননি। এই নিয়ে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় ওঠে। এমন কি অস্ট্রেলীয় দলের কেউ কেউও বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে এই সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারেন নি। একজন প্রতিবাদ করে বসলেন। আর্মস্ট্রং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তাহলে তুমিই আগে ব্যাট করতে যাবে, চটপট প্যাড পরো। জেনে রাখ তিনদিন পরই টেস্ট খেলতে হবে, আমি বোলারদের এখন খাটাতে চাই না।"

কেণ্টকে ফলো-অন না করানোয় কাগজে কাগজে আর্মস্ট্রংয়ের তীব্র নিন্দা হয়। খেলা শেষে কেণ্টের সভাপতি লর্ড হ্যারিস বলেন, "অস্ট্রেলীয় দলের দশজনকে আবার দেখতে পেলে কেণ্ট খুবই খুশি হবে।" অনামন্ত্রিত একাদশ ব্যক্তিটি যে কে, সেটা বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয়নি। পরের টেস্ট ওভালে। খেলার শেষদিন সকালেই বোঝা গেল খেলা ড্র হতে চলেছে। চা-পানের পর আর্মস্ট্রং চারজন ব্যাটসম্যানকে ডেকে তাদের হাতে বলটি দিয়ে বলে দিলেন, বাকি সময়টা তোমরাই ভাগাভাগি করে বল করো। এই নির্দেশ দিয়ে তিনি বাউণ্ডারীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা ইংরেজদের পক্ষে রীতিমত অপমানকর হয়ে উঠল যখন, হাওয়ায় উড়ে আসা একটা খবরের কাগজের পাতা পা দিয়ে তুলে নিয়ে আর্মস্ট্রং গভীর মনোযোগে পড়তে শুরু করলেন। মাঠের মধ্যে তখন টেস্ট খেলা চলেছে। পরে তিনি বলেন, "কাদের সঙ্গে খেলছি সেটা জানার জন্য কাগজটা পড়ছিলাম।" আর্মস্ট্রং এইভাবে তাঁর কুড়ি বছরের টেস্ট জীবনের শেষ মিনিটগুলি কাটিয়েছিলেন।

ওই বছরই লর্ড হ্যারিসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে। ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে ফাটকা—ছিল আলোচনার বিষয়। লর্ড হ্যারিস তো উড়িয়েই দিলেন বিষয়টি অবাস্তব বলে। "লর্ড হ্যারিস, আপনি কি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে ফাটকা হয় না?" আর্মস্ট্রং বললেন।

"নিশ্চয়। ক্রিকেটের উপর লোকে ফাটকা খেলে না। এসব কথা একদমই বাজে এবং হাস্যকর।" রাগত স্বরেই লর্ড মহাশয় জবাব দিলেন।

"আপনি যদি আমাদের পরের টেস্টে শ পাঁচেক পাউণ্ড কামাতে চান, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

এরপর লর্ড হ্যারিস আর একটি কথাও বলেননি আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে।

আর্মস্ট্রং যে বল ড্রাইভ করেছেন বা যে চেয়ারে একবার বসেছেন, আকৃতিতে তা আর আগের মত থাকত না। এর কারণ তাঁর বিপুল আকৃতি। উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, ওজন ২১ স্টোন! এজন্য ওকে বলা হত "দি বিগ শিপ"। দল নিয়ে মাঠে নামতেন যখন মনে হত বিরাট এক মানোয়ারী জাহাজ, দশটা গাদাবোটকে টেনে আনছে। মেলবোর্ন প্যাভিলিয়নের সংগ্রহশালায় সব থেকে দ্রষ্টব্য বস্তু আর্মস্ট্রংয়ের সার্টটি। তাই দিয়ে একজন মানুষের তাঁবু হয়ে যায়। সেলাই খুললে নৌকার পালও হয়! বুটজোড়া হুটো ডিঙ্গি নৌকোর মত। বুটের লেস যেন কাছি!

ওয়ারউইক আর্মস্ট্রংকে নিয়ে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ১৯১২-য় প্রচুর ঝঞ্ঝাট হয়েছিল। 'বিগ শিপ'কে ডুবিয়ে দেবার বহু চেষ্টা হয়, কিন্তু অসাধারণ মনোবল, ব্যক্তিত্ব, নিজের উপর আস্থা, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দ্বারা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে 'বিগ শিপ' বন্দরে ভিড়েছে প্রতিবার। একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করলেই ওর স্বভাব বোঝা যাবে।

শেফিল্ড শীল্ডের একটি খেলায় স্লিপে ফিল্ড করছেন। ব্যাটের খোঁচায় বল গেল ফাইনলেগ বাউণ্ডারীর দিকে। বিরাট বপু নিয়ে আর্মস্ট্রং তাড়া করলেন এবং বলটিকে ধরলেনও। ছোঁড়ার জন্য হাত তুলেছেন, তখন দর্শকদের একজন পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, "কাম অন আর্মস্ট্রং। চটপট থ্রো করো।" সঙ্গে সঙ্গে বল ধরা হাতটি তিনি নামিয়ে ধীরে সুস্থে স্লিপে নিজের জায়গায় এসে, আস্তে ছুঁড়ে বোলারকে বলটি ফেরৎ দিলেন। কারুর নির্দেশ পালন করার মত বান্দা ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং ছিলেন না। ব্র্যাডম্যানকে তিনি আহা-মরি কিছু মনে করতেন না। মরিস টেট বা বিল ওরিলীকেও বিশ্ব পর্যায়ের বোলার মানতে রাজী ছিলেন না। জ্যাক ফিঙ্গলটন টেস্টে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হু ইনিংসেই শূন্য রান করেন অ্যাডিলেডে। প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মেঞ্জিস তরুণ ব্যাটসম্যানের এহেন মন্দভাগ্যে

দুঃখ প্রকাশ করে তাকালেন আর্মস্ট্রংয়ের দিকে। 'বিগশিপ' তার মুখ থেকে পাইপটি অথবা ফানেলও বলা যায়, নামিয়ে শুধু মন্তব্য করেন ঃ "ব্যাট করতে জানে না।"

ক্রিকেটে চরিত্র অজস্র। মিছিলের মত তারা এসেছে একশো বছরেরও ওপার থেকে। কেউ কুটিল কেউ দাম্ভিক, কেউ বিনয়ী। এরা ক্রিকেটকে বর্ণাঢ্য করেছে। মহনীয়তা দিয়েছে। গম্ভীর করেছে। হাসিয়েছে। ক্রিকেট মাঠ ছিল এদের কাছে মঞ্চের মত। সেখানে এসে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করতেন চরিত্র। স্কোর বোর্ডের চৌহদ্দিতে শুধু এঁদের সৃষ্ট কিছু সংখ্যাই ধরা পড়েছে মাত্র, আসল মানুষগুলি তার বাইরেই রয়ে গেছেন।

□ লর্ডস মাঠের একদিন □

জনৈক ইংরাজ কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়, একটি আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—যশোকাঙ্ক্ষাই মানুষের চরম বাসনা।

কথাটা নিয়ে আর যেকেউ তর্ক তুলুক, ক্রিকেট খেলোয়াড়রা কখনোই তুলবেন না। দর্শকদের হৃদয়ের কোন অন্তস্থলে যে সেই গগনবিদারী চীৎকারের উৎপত্তি, যার জন্য খেলোয়াড়রা চিরকাল তপস্যারত—তার হদিশ কেউই জানে না। খেলার রেকর্ড বইয়ে বহু কৃতিত্বের বিবরণ বাসি বিবর্ণ হয়ে রয়েছে। অস্ফুট ধ্বনিও তা থেকে আর টেনে আনা যায় না।

রেকর্ড গড়ে এবং আবার তা ভাঙে। এই ভাঙাগড়ার খেলা নিত্য চলেছে। কিন্তু খেলোয়াড়দের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে, যা চিরকাল তার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই মুহূর্তের যারা সাক্ষী তাদেরও। আর যারা, আমাদের মত বহুকাল পরে বহুদূরে থেকে শুধু ছাপা অক্ষরের ভরসায় কল্পনা সার করি, তখন খেই পাই না আশী বছরের জ্যাক হবসের বা নব্বুই বয়সী অন্ধ উইলফ্রেড রোডসের নির্জন অবসরে, কোনদিন কোনমাঠের গগনবিদারী ধ্বনি তাঁদের কানে বাজতো।

কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ই এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি। লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু দর্শকরা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বলতে পারেন, কত বড় চীৎকার কবে, কোন মাঠে, তাঁরা শুনেছেন। (ইডেন উদ্যানের রেকর্ড, আমার ধারণায়, ১৯৪৮-৪৯এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলির শত রান পূর্ণের সময়) যদিও আমরা ধরে নিই ছয়টি উইকেট

লাভ মোটামুটি শত রান করার সমান, কিন্তু এই চীৎকার, যাকে সংবর্ধনা বলাই ভাল, তা মাপার কোন হিসাব আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ক্রিকেটের ইতিহাসে সব থেকে বড় করতালি বা সোল্লাস সংবর্ধনা কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে রেকর্ড বইয়ে তা নেই, অনেকের মতে তা হাটনের উদ্দেশ্যে, যখন ৩৬৪ রান করে ওভাল মাঠের মাঝখান থেকে ফিরছিলেন। অনেকে বলেন লেকারের উদ্দেশ্যে, ১৯টি উইকেট দুহাতে ভরে যখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ড প্যাভিলিয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন।

ক্রিকেটের এক অনবদ্য লেখক ডেনজিল ব্যাচিলর, একটি প্রবন্ধে ১৯২৮-এর জুন মাসের একটি দিনের উল্লেখ করে বলেছেন—লর্ডস মাঠের জীবনে মানুষের গলা থেকে একসঙ্গে অত জোরে আর কখনো শব্দ বেরোয়নি। লিয়ারী কনস্টানটাইন সেদিন যে আলো জ্বালিয়েছিলেন, জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ইতিপূর্বে তা ছিল না। ক্রিকেট ইতিহাসেও এখন পর্যন্ত এ রকম একক নৈপুণ্যের তুলনা পাওয়া ভার।

সে খেলার কথা পুরনো হবার নয়, তাই একটু বলে নেওয়া যাক। প্রথম দিনে মিডলসেক্স ছয় উইকেটে ৩৫২ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। কনস্টানটাইন পান ৭৭ রানে একটিমাত্র উইকেট। দ্বিতীয় দিনে খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭৯ রানে পাঁচটি উইকেট খোয়াল। ফলো-অন রক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না এখন। বাকি পাঁচজন আর কত করবে? একশো করুক! তাতেও ফলো-অন রক্ষা পাবে না।

খেলতে নামলেন কনস্টানটাইন। অপর ব্যাটসম্যান প্রবীণ ফ্র্যাঙ্ক মার্টিন এগিয়ে এসে ওঁকে পরামর্শ দিলেন, ডার্সটন এবং 'গাবি' অ্যালেনের দুর্দান্ত গতির বল এবং ইয়ান পীবলসের চতুর গুগলি কিভাবে দেখেশুনে খেলা উচিত। লিয়ারী বাধ্য অনুজের মত ঘাড় নাড়লেন।

তারপর যা শুরু হল, সামরিক পরিভাষায়, তার নাম 'কার্পেট-বম্বার্ডমেণ্ট।' ঋজু ভঙ্গিতে তিনি ব্যাট ধরে দাঁড়ালেন, চোখে

নায়কোচিত হাসি। সামান্যতম লাফালাফিও নয়। অলস ভঙ্গিতে প্রথম ওভারেই অ্যালেনের একটি বিদ্যুৎগতি বলকে কভার পয়েন্টের মাথার উপর দিয়ে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে ফেলে দিলেন। অসম্ভব এই মার দেখে চমকে উঠল লর্ডস। পর পর তিন ওভারে তিনি অ্যালেনের কাছ থেকে আদায় করলেন ৯, ১০ এবং ১৭ রান। পাওয়েলের কাছ থেকে এক ওভারে আরো ১৪ রান। ১৮ মিনিটে ৫০ রান।

আরো ৩৭ মিনিট তিনি উইকেটে ছিলেন। তার মধ্যেই মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর কিরণে ঝলসে দিলেন লর্ডসকে। পীবলসের একটি গুগলি অবশেষে তাঁর ইনিংসকে শেষ করে। ৫৫ মিনিটে ৮৬ রান করে কনস্টানটাইন ফিরলেন, তখন শুধু প্যাভিলিয়ান নয়, সারা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালো। বয়স্করা তাড়াতাড়ি তাদের শিশুদের মুখ থেকে টফি লজেঞ্জস ইত্যাদি ফেলে দিলেন। চীৎকার করতে গিয়ে যদি গলায় আটকে যায়!

অল্প পরেই লিয়ারী বল করতে নামলেন। ঘূর্ণি ঝড়ের গতিতে তাঁর হাত থেকে বল ছুটল। সংহারের আনন্দে যেন মেতে উঠল ত্রিনিদাদের এই যুবক। ৩৫ বলে ১১ রানে ৬টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত ৫৭ রানে ৭ উইকেট। লর্ডস মাঠ আর একবার উঠে দাঁড়ালো সংবর্ধনা জানাতে।

ব্যাট করতে নামলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ২৫৯ রান দরকার জয়লাভের জন্য। কিন্তু প্রথমে যা মনে হয়েছিল অপমানকর পরাজয় এখন তা দাঁড়াল সম্মানজনক হার, কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২১ রানে ৫টি উইকেট খুইয়েছে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে এ ধরনের পরাজয় কাহিনী নাতিনাতনীদের কাছে গল্প করার মত।

কিন্তু আর এক গল্প ইতিমধ্যে মাঠে তৈরী হতে শুরু করেছে। ব্যাট হাতে কনস্টানটাইন নেমেছেন। ডার্সটনের প্রথম বলই কভারের মধ্য দিয়ে বাউণ্ডারীতে ছুটে গেল, নিকটতম ফিল্ডার ঘুরে দাঁড়াবার আগেই। মুহূর্তের মধ্যে মিডলসেক্সের রক্ত গরম হয়ে উঠল। জল

পোকার মত প্যাটসি হেনড্রেন বাউণ্ডারী লাইনের ধারে ছোটাছুটি শুরু করলেন। ফ্র্যাঙ্কম্যান দুর্ভেদ্য বালির বস্তার মত মিড অফে দাঁড়ালেন। জ্যাক হিয়ার্ন শাদা পোশাক গোয়েন্দার মত অফসাইডে প্রহরা দিতে থাকলেন; কিন্তু লিয়ারীর মারা একটি বল তাঁর ডান হাতের আঙুলে লাগায় হাত চেপে ধরে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সে মরশুমেই আর খেলেননি।

কলকাতা থেকে চুঁচুড়া যেতে ট্রেনে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় লিয়ারী উইকেটে ছিলেন। ২টি ছয় এবং ১২টি চার সমেত ১০৩ রান করে যখন ফিরলেন, তখন ৯ রান জয়ের জন্য বাকি এবং চারটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ উইকেট অটুট।

তৃতীয়বারের মত তিনি সংবর্ধিত হলেন। কিন্তু এই তৃতীয়টি তুলনায় অন্য দুটিকে ম্লান করে দিয়েছে। মুক্তির আদেশ পাওয়া ফাঁসির আসামীর মত লর্ডস চীৎকার করে উঠেছিল। আজও মধ্য-বয়সী এক তামাক ব্যবসায়ীকে লণ্ডনে পাওয়া যাবে, যিনি ফিসফিসের বেশি জোরে কথা বলতে পারেন না। এর কারণ, কনস্টানটাইন শত রান করলে তিনি এমন চীৎকার করেছিলেন যে, চিরকালের মত তাঁর স্বরনালী জখম হয়ে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী সংবর্ধনার নজীর হিসাবে অবশ্য ১৯২৬-এর ওভাল টেস্টের উল্লেখ করা হয়। ১৪ বছর পর সেই প্রথম ইংল্যাণ্ড অ্যাসেজ ফিরে পেল, যখন জর্জ গিয়ারীর বলে আর্থার মেইলি আউট হলেন। মন্ত্রিসভা সহ স্ট্যানলী বলডুইন সেদিন ওভালে উপস্থিত ছিলেন।

মেইলি একবার বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার সব থেকে বড় সংবর্ধনা, তিনি অন্তত যা শুনেছেন, সেটি হল মেলবোর্ন মাঠের মেম্বার স্ট্যাণ্ডের ষষ্ঠ সারিতে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন নিখুঁতভাবে একটি ক্যাচ ধরেন। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ১৯২৬-এর সেই খেলায় মেইলি ৩৬২ রানে চারটি উইকেট পান। তবে ১৯৬০-এর ব্রিসবেন টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ায় ইতিপূর্বে যা কিছু শোনা গেছে তার প্রত্যেকটিকেই

ছাপিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ায় আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৩২-এ প্রথম টেস্টে লারউড ৯৮ রানে আয়রনমঙ্গারের হাতে ক্যাচ আউট হন। যে বিপুল কলরব সেদিন শোনা যায়, অনেকের মতে যেহেতু লারউড শত রান করতে পারলেন না সেই আফশোষে, অনেকের ধারণা আয়রনমঙ্গারকে সেই প্রথম ক্যাচ লুফতে দেখা গেল বলে।

১৮৭০-এ কেমব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় শেষ ওভারে ব্যাপার দাঁড়ায়, অক্সফোর্ড দু রান করলে জিতবে, হাতে তিনটি উইকেট। শেষ তিনটি বলে কেমব্রিজের কবডেন উইকেট তিনটি দখল করে নেয়। তখন মাঠে কি দৃশ্য দেখা গিয়েছিল এখন তা কল্পনায় ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

□ ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে চরিত্রের উদঘাটন হয় □

১৯৬৭-র মে মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল সফরের জন্য ইংল্যাণ্ডে পেঁছিলে লর্ডস মাঠের বিখ্যাত ও প্রাচীন সরাবখানা 'ট্যাভারনের' সদস্যরা তাদের স্বাগত জানিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেন কাফে-রয়্যাল হোটেলে। সেখানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন স্যার নেভিল কারডাস। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল ঃ ক্রিকেটারের ব্যক্তিত্ব। তিনি যা বলেন, তার সারাংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

ইংল্যাণ্ডে 'ব্রাইট' ক্রিকেট নিয়ে এখন খুবই কচকচানি চলছে। এই সুদর্শন ও বিনয়ী সফরকারীদের কাছে আমার নিবেদন ও-সব কথা নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা করার দরকার নেই। সময় নাও, তাড়াহুড়ো করে খেলার দরকার নেই, তোমাদের দেশজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাভাবিক খেলা খেলে যাও। ইংল্যাণ্ডে এখন ক্রিকেট নিয়ে যে ক্ষোভ জমে উঠেছে, তার উৎপত্তির কারণ ক্রিকেটকে প্রধানতই এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হিসাবে ভাবা হচ্ছে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য, দু দলের একটির জয়ী হওয়া।

কিন্তু প্রথমশ্রেণী পর্যায়ে ক্রিকেট কিছুতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনা। ফুটবল বা রাগবীর মত গায়ে গা লাগিয়ে খেলা যখন শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায়, তখন বয়কটের হাত জমে উঠেছে মাত্র।

এইবার আমি আসল কথায় আসছি—প্রত্যেক ক্রিকেট ম্যাচেই সবসময় একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তলেতলে চলে বোলারের সঙ্গে ব্যাটসম্যানের। চল্লিশ বছর আগে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখত

ম্যাকডোনাল্ড আক্রমণ করছেন হবসকে (সোমবারেও ১৪ হাজার দর্শক মাঠে যেত) লারউড বনাম উলী (স্ট্রেট ডীপে একজন ফিলডসম্যান রেখে) টেট সম্মুখীন হচ্ছেন হেনড্রেনের, লক মতলব ভাঁজছে কম্পটনকে উৎখাত করার—এইভাবেই চলে আসছে আজ পর্যন্ত। ক্রিকেট আসলে সবসময়ই দলগত খেলা নয়। এটা দেখার ব্যাপার, একটা মঞ্চ যেখানে ব্যক্তিত্বের উন্মোচন ঘটে। প্রথম শ্রেণী পর্যায়ের ক্রিকেটে একটা খেলা বহুক্ষণ ধরে চলে এবং সময় যতই অতিক্রান্ত হয়, চরিত্রেরও উদ্ঘাটন হয়। পৃথিবীতে ব্যাটস-ম্যান একা দাঁড়িয়ে সম্মুখীন হচ্ছে ওয়েস হলের। হল তার শক্তিকে সংহত করছে, তাকে আমাদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। কেউ তাকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারে না। সেই রকমই যে ফিল্ডসম্যান লং-অনে দাঁড়িয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ তাকে নজরেই আনল না তারপরই হঠাৎ একটা ক্যাচ উঠল আকাশে। ফিল্ডসম্যানটি ক্যাচ ধরার জন্য অপেক্ষা করছে। হাজার হাজার চোখ তখন তার উপর। দলগত খেলা ? তার সঙ্গী খেলোয়াড়দের ডেকে কি সে তখন বলতে পারে, "শিগ্‌গিরী এসে সাহায্য কর, ভীষণ শক্ত ক্যাচ।" না, পারে না। তাকে একাই ক্যাচটা লুফতে হবে। যখন সে দু-হাত জোড়া করে, মাতালের মত বলের নীচে টলতে থাকবে—খেলাটা যদি ত্রিশের দশকের ল্যাংকাশায়ার বনাম ইয়র্কশায়ার হয়—তাহালে বেচারা ফিল্ডসম্যান তার পিছনে হয়তো একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পারে—"ফসকাবে, ব্যাটা ঠিক ফসকাবে—ওই দ্যাখো যা বলেছি!"

চরিত্রের উদ্ঘাটনের কথা বলেছি। এখন কি তা হয় ? স্টাইল মানুষকে প্রকাশ করবে কি করে, যদি মাতামাতি শুধু পয়েন্ট সংগ্রহের জন্যই চলতে থাকে, আর লোককে আকর্ষণ করার জন্য 'ব্রাইটনেশের' টোপ ফেলা হয় ? বিশের বা ত্রিশের দশকে ল্যাংকাশায়ার বনাম ইয়র্কশায়ার খেলার প্রথম দিন মাঠে ৪০

হাজার দর্শক থাকত (গত বছর গোটা মরশুমে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এত লোক হয়নি)। সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (এবং লাভজনক) যুগে ল্যাংকা-শায়ার-ইয়র্কশায়ার ম্যাচ শেষ হবে, নিষ্পত্তি হবে কদাচিৎ প্রত্যাশা করা যেত। তাহলে এত লোক পয়সা খরচ করে খেলা দেখত কেন?

তারা যেত দেশের উত্তরখণ্ডের চরিত্রের কার্যকলাপ দেখতে। রোডস তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মেকপীসকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে—মেকপীস এমনই লোক এই 'গোলাপের যুদ্ধে' যাঁর নীতি ছিল "যদি টসে জিতি, বুঝলে হে ছোকরারা, লাঞ্চের আগে একটাও চার নয়।" মন্থর খেলা? মজার ব্যাপার, এইসব ব্যাটসম্যানরা ইচ্ছে করলেই দ্রুত রান তুলতে পারতেন। কিন্তু তা থেকে বিরত হতেন 'নীতিগত কারণে'।

সেই রকম দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে, হোভের মাঠে বৌলি তার রৌদ্র-করোজ্জ্বল ব্যাটিংএর দ্বারা আমাদের বলে দেয় সাসেক্সের গ্রীষ্ম এবং প্রখর আলোর কথা। তেমনি ক্যাণ্টারবেরিতে ফ্র্যাঙ্ক উলী, চ্যাপম্যান এবং ভ্যালেণ্টাইন প্রত্যেকেই ক্রিকেট মারফৎ আমাদের বলে দেন, তাঁরা কে এবং ক্রিকেটার হিসাবে কোথায় লালিত হয়েছেন।

উনিশ শতকে, যখন ক্রিকেটে যতদূর ইংরেজীয়ানা থাকা সম্ভব—স্ট্রেট ব্যাট, লেংথ বল, এবং 'গুগলি' নৈতিক অপরাধ—তখন আমাদের ক্রিকেট মাঠে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে। এ ঘটনার কথা আগে বহুবার বলেছি, আমাদের ভারতীয় সফর-কারীদের সুবিধার্থে আবার বলছি। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সময়ে একজন ব্যাটসম্যানকে দেখা গেল সম্পূর্ণ অ-ইংরাজ পদ্ধতিতে খেলছে, সূক্ষ্মভাবে, বঙ্কিমভঙ্গিতে, কখনো কখনো প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ইংরেজি নীতিজ্ঞানের বিরোধিতা করে—কব্জির ছোট্ট একটা মোচড়, আর অবাক কাণ্ড! লেগে একটা গ্লানস আর ওদিকে ফাষ্ট বোলারটি (সম্ভবত বিল লকউড) দুহাত তুলে ভগবানের কাছে মিনতি জানাচ্ছে।

এই ব্যাটসম্যান হলেন কুমার রঞ্জিতসিংহজী, যিনি ইংল্যাণ্ডেরই এক তৃণক্ষেত্রে ক্রিকেট আয়ত্ত করে, ক্রিকেট মারফৎ তাঁর জাতির গুণাবলীকে প্রকাশ করে গেছেন—প্রাচ্য প্রতিভার গুণাবলী। ইংল্যাণ্ড ও ইয়র্কশায়ারের টেড ওয়েনরাইট বলেছিলেন, "রঞ্জি জীবনে একবারও ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রোক করেননি।"

আমার প্রার্থনা এই যে, আমাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয়রা, এই গ্রীষ্মে আমাদের ক্রিকেট মাঠে রোজ যখন খেলতে নামবে, তখন যেন মনে রাখে, 'রঞ্জি' এবং সেই সঙ্গে দলীপ সিংহজীর নাম —এবং তাঁদের স্বজাতিরই অন্যান্যদের নাম যারা অন্যদেশীয় বনে যাবার যাবতীয় প্রলোভন সত্ত্বেও ইংরেজ ক্রিকেটারের অনুরূপ না হয়ে দেশীয়ই রয়ে গেছেন। আমি যদি ভারতের অধিনায়ক পতৌদির নবাব হই, তাহালে আমি চাইব ব্রায়ান ক্লোজের মত লোকেদের কর্মবিধিকে খুশি করে জেতার চাইতে 'রঞ্জির' আত্মা তৃপ্ত হয়, এমনভাবে খেলে যেন হেরে যাই।

নেভিল কারডাসের বক্তৃতা শোনার পর থেকে ভারত পরপর সাতটি টেস্ট হারে। আর এখন যে রকম খেলা দেখাচ্ছে, তাতে 'রঞ্জি' বা দলীপের আত্মা যে আর একবার মৃত্যু-কামনা করেছে সে, বিষয়ে কারুরই দ্বিধা নেই। রঞ্জির খেলায় প্রকাশ পেয়েছিল প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য। আর এখনকার ক্রিকেটারদের খেলায় কি প্রকাশ পাচ্ছে কে বলতে পারে?

১৯৩২-এ কারডাস প্রথম ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে ল্যাঙ্কশায়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলা দেখে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় যে রিপোর্ট লেখেন তাই পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গেলাম। হিসাব করে দেখলাম ভদ্রলোকের তখন ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র ৪২। অথচ লিখছেন—"গতকাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যে ক্রিকেট খেলা দেখালেন, ল্যাঙ্কশায়ার বিজয়ী হয়েছে এই তথ্যটি ভুলে যাবার

পরেও দীর্ঘকাল ধরে কৃতজ্ঞতা সহকারে তা স্মরণ করব। এছাড়াও ভারতীয় ব্যাসম্যানরা ঐতিহাসিক সমস্যা জড়িত একটি প্রশ্নের উপরেও আলোকপাত করেছে। দীর্ঘকাল ধরে আমি ক্রিকেট ব্যাটের আকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করে আসছি। আশা করছি কোন না কোনদিন এই গবেষণার ফল সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারব। প্রবন্ধটি খুবই দর্শনসমৃদ্ধ হবে, তাতে একটি পরিশিষ্টও থাকবে। তাতে আমি ভারত থেকে আগত এই ক্রিকেটারদের প্রতি ঋণ স্বীকার করব। কারণ এরা আমাকে এমন সব প্রমাণ সরবরাহ করেছে যা ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মাঠ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কয়েক বছর ধরেই আমি জানার চেষ্টা করছি ক্রিকেট ব্যাটের ব্লেডে বর্তুলাকার ভারী অংশটুকু সম্পর্কে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে।

একটি ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থও আছে, তাছাড়াও আছে একটি হ্যানডেল ও একটি ককুদ। নিশ্চিত জানি, আধুনিক পেশাদাররা বলবে যখনই এক চিলতে ঘাস পীচে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে তখন পিটিয়ে সমান করার জন্যই ক্রিকেট ব্যাটের এই ককুদটির প্রয়োজন। আমার থিওরী, ক্রিকেট ব্যাটের পিঠে এই বক্রতার উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগেই যখন মানুষের মারমুখী আক্রমণ প্রবৃত্তির কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।.... এখন এই ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে খেলা খেলল, তা অনেকটা সেই কুখ্যাত বর্বর ইংরাজদের মতই যারা প্রায়শই অস্ট্রেলিয়া অভিযানে গিয়ে ফাস্ট বোলারদের ডাইনে-বাঁয়ে বেধড়ক পেটাত। গত দিনের খেলার যেকোন একটি ঘণ্টায় আমরা যত সুন্দর কাট ও ড্রাইভ দেখেছি, সারা মরশুমে এই মাঠে অমনটি আর দেখা যায়নি। পাছে একটা সুন্দর মার চোখ এড়িয়ে যায় এই ভয়ে এক মুহূর্তের জন্যও কারুর পক্ষে খেলা থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এখনকার সাধারণ ইংরেজ ক্রিকেটারদের কাছ থেকে আশাই

করা যায় না ভারতীয়দের মত এমন উৎকৃষ্ট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাটিং।'

আমার পক্ষে আর পড়া সম্ভব নয়। এ কোন ভারতীয়দের কথা পড়ছি! কারডাসের কলম থেকে এই লেখা আদায় করে নিয়েছে যারা তাদেরই উত্তরপুরুষ কি এখন ক্রিকেট খেলছে? বিশ্বাস হয় না। বেঁচে থাকলে কারডাস যদি তার নিজের লেখাটি এখন একবার পড়তেন মনে হয় (মাথা চাপড়ে) আক্ষেপ করে বলে উঠতেন—'রেয়ার সি কে নায়ডু অ্যাণ্ড হিজ কলিগস। উই শ্যাল নট লুক অন দেয়ার লাইক এগেন। দে ওয়্যার বায়লজিক্যাল স্পোর্টস ডেভিয়েশ্যনস ফ্রম টাইপ অ্যাণ্ড মৌল্ড।'

□ একদা ভারতে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলাররা ছিল □

১৯৬৯-এ নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরে আটটি টেস্টে সাতজনকে—আবিদ আলি, চেতন চৌহান, অজিত ওয়াড়েকর, ইন্দ্রজিত সিংহজী দিলীপ সরদেশাই, ফারুক এনজিনীয়ার, অশোক মাঁকড়—আমাদের ব্যাটিং ইনিংস শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ছটি ইনিংসে আমাদের প্রথম উইকেট পড়ার সর্বোচ্চ রান ৫৫ (আবিদ ৩৩ ও চেতন ১৪)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দশ ইনিংসে ৫০-এর বেশি রান তোলায় আটবার ব্যর্থ হয়েছে ওপেনিং জুটি। বাকি ছুটি ইনিংসে ৮৫ ও ১১১ রান ওঠে ফারুক ও অশোকের চেষ্টায়। অর্থাৎ ১৬ ইংনিসের মধ্যে তেরোবারই আমাদের ব্যাটিং ইনিংসের ভিত্তি অর্ধশত রানের উপর ওঠেনি।

অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপেও একই অবস্থা প্রায়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম উইকেটে শত রানের ভিত্তি তৈরী করতে পারে নি। নিউজিল্যাণ্ড পেরেছে একবার। কিন্তু তার কারণ আমাদের পেস বোলাররা নন—প্রসন্ন, বেদী এবং বেঙ্কটরাঘবন। ছুটি সিরিজে ওপেনিং ব্যাটসম্যানদ্বয়ের ৩২টি উইকেটের মধ্যে প্রসন্ন একাই ১২, নট আউট ৫, বেঙ্কটরাঘবন ৪, রান আউট ৩, বেদী ২। অর্থাৎ আমাদের ওপেনিং বোলাররা পেয়েছে মাত্র ৬টি। ওপেনিং বোলাররূপে ১৬ ইনিংসে বল করেছে সাতজন—রুসি সূর্তি, অজিত পৈ, আবিদ আলি, জয়সীমা, সুব্রত গুহ, একনাথ সোলকার ও মহীন্দর অমরনাথ। উক্ত ছয়টি উইকেটের মধ্যে অমরনাথ—১ সুব্রত—১, সূর্তি—২, আবিদ—২।

ভারতের সেরা সাতজন—ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও ওপেনিং বোলারের (না হলে টেস্টে খেলান হল কেন !) টেস্ট নৈপুণ্য থেকে একটি কথা স্পষ্ট—আমাদের উইকেট ফাস্ট বোলার তৈরীতে অক্ষম তাই ব্যাটসম্যানরাও অনুশীলন না পেয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। আমাদের টেস্ট খেলার ইতিহাসে ব্যাপারটা কিন্তু প্রথম কুড়ি বছরে এমন শোচনীয় ছিল না। তখন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলারের অভাব ছিল না, বরং স্পিনারই দুর্লভ ছিল।

ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ লর্ডসে, ১৯৩২-এর জুনে। আমাদের দলে সেদিন কোন খাঁটি স্পিন বোলারই ছিল না। সি কে নায়ডু উঁচু করে অফ-ব্রেক বল দিতেন বটে, কিন্তু খাঁটি স্পিনারের পংক্তিতে তাঁকে রাখা যায় না। জার্ডিনের ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সিরিজে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে, ৪১ বছরের জামসেদজাকেই আমাদের প্রথম টেস্ট স্পিন বোলাররূপে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই। এই লাটা পার্শি বোলার তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন, কিন্তু আর ওকে টেস্ট খেলতে ডাকা হয় নি। কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে এলেন সি এস নায়ডু। ইনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতায় টেস্ট স্পিন বোলারদের আদিপুরুষ। কলকাতা ও মাদ্রাজ টেস্টে ওঁকে মোট বল করতে দেওয়া হয়েছিল ২৩ ওভার যদিও অধিনায়ক ছিলেন ওর দাদা সি-কে। দুটি টেস্টে সি-এস কোন উইকেট পান নি।

১৯৩৬ ইংল্যাণ্ড সফরে খাঁটি স্পিনার তো কেউই ছিলেন না। অমরনাথকে ফেরৎ পাঠানোয় তাঁর বদলী হিসাবে সি এস নায়ডু ইংল্যাণ্ড যান। পালিয়া প্রধানতই ব্যাটসম্যান, কিন্তু তাঁকেই স্পিন বোলাররূপে টেস্টে কাজ চালাতে হয়েছিল। ১৯৩৬ লর্ডস টেস্টে সি-এস মাত্র তিন ওভার বল করার সুযোগ পান এবং কোন উইকেট পান নি। তিনটি টেস্টে খেলে একটিও উইকেট না পাওয়া সত্ত্বেও একজন স্পিন বোলারকে চতুর্থবার খেলার সুযোগ দেওয়া

হচ্ছে এমন ব্যাপার এখন অকল্পনীয়। ওল্ড ট্রাফোর্ডে সি এস নায়ডু ১৭ ওভার বল করে টেস্টে প্রথম একটি উইকেট পান ৮৭ রানে।

১৯৩২ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাতটি সরকারী ও নয়টি বেসরকারী টেস্টে ভারতের বোলার ছিলেন দুজনই—মহম্মদ নিসার ও লালা অমর সিং। একমাত্র এই দুজনের পেস ও সুইং-এর উপরই নির্ভর করত ভারতের টেস্ট আক্রমণ। সাতটি সরকারী টেস্টে ৮৪টি উইকেট পান ভারতের বোলাররা, তার মধ্যে নিসার পেয়েছেন ২৫ ও অমর সিং ২৮—অর্থাৎ তিনভাগের দুইভাগ এই দুজনের। এই দুজনের আমলে ভারতের বিরুদ্ধে সরকারী টেস্টে শতরানের ওপেনিং পার্টনারশীপ একবারই হয়েছে, ১৯৩৩-৩৪, মাদ্রাজে। কিন্তু ১৯৩৬ ইংল্যাণ্ড সফরে আমাদের প্রথম উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান, বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি, ২০৩ রানের পার্টনারশীপ তৈরী করে অ্যালেন, গোভার, হ্যামণ্ড, ভেরিটি ও রবিন্সের পেস, সুইং, অফ-ব্রেক ও গুগলি ব্যর্থ করে। কুড়ি বছর পর প্রথম উইকেটের এই সংখ্যা অতিক্রান্ত হয় বিনু মাঁকড় ও পঙ্কজ রায়ের ৪১৩ রানের দ্বারা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর দ্বি-শত রানের পর ভারতের প্রথম উইকেট পতনের নজীর পাওয়া যায় নি।

১৯৩৬-এর জুলাইয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডেই প্রথমবারের মত মার্চেন্ট মুস্তাক একত্রে ভারতের ইনিংস শুরু করেন। খেলোয়াড় জীবনে ওঁরা দুজন মাত্র চারটি সরকারী টেস্টের সাতটি ইনিংস একত্রে ওপেন করেছেন। তার মধ্যে ওঁরা তিন ইনিংসে তোলেন—২০৩, ১২৪, ৯৪। এই দুজন যখন ক্রিকেট খেলা শিখেছেন, তখন ভারতের উইকেট ফাস্ট বোলারের সহায়ক ছিল।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ভারতে খাঁটি স্পিনার খুব কমই ছিলেন। টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করার মত একজনও ছিলেন না। ১৯৩৬-এ অমরনাথের বদলে সি এস নায়ডুকে পাঠান হলে ডগলাস

জার্ডিন মন্তব্য করেছিলেন, একজন ল্যাটা স্পিনারকে পাঠালে ফলাফলের অনেক হেরফের ঘটতে পারত। কিন্তু পাঠাবার মত একজনও তখন ছিলেন না। বিন্নু মাঁকড় এলেন দু বছর পর। এখন তো ঝাঁকে ঝাঁকে স্পিনার দেখা যাচ্ছে। এটা ঘটতে শুরু করেছে গত কুড়ি বছর। ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে ঝোঁক পড়ায় টেস্ট ম্যাচ-গুলিকে পাঁচদিন ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য এমনভাবে উইকেটগুলি তৈরী করা হল যার ফলে নির্জীব উইকেটে ছেলেরা আর জোরে বল করায় উৎসাহ পেল না। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে আপনা হতেই শক্তি ও শৌর্যের বিদায় ঘটে। নিষ্প্রাণ উইকেটে বল করে করে রমাকান্ত দেশাই তো দশ বছরের মধ্যেই নিজেকে খাক করে বিদায় নিলেন।

ফাস্ট বোলিং উৎখাত করার মারাত্মক ফল সব থেকে বেশি ফলেছে, বিদেশে আমাদের টেস্ট খেলাগুলিতে। ১৯৫৯ ইংল্যাণ্ড সফরে পাঁচটি টেস্টেই আমাদের হার হয়। পরের সফর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এবং পাঁচটি টেস্টেই পরাজয়। তারপর আবার ইংল্যাণ্ড এবং সিরিজের সবক'টি টেস্টে (তিনটি) আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। একটি টেস্টে কুন্দরন পর্যন্ত বল ওপেন করেছিলেন। এর পর অস্ট্রেলিয়া সফর এবং এখানেও সবক'টি টেস্টেই (চারটি) আমাদের মাথা হেঁট।

বিদেশের মাটিতে টানা সতেরোটি টেস্টে পরাজয়! কারণ? মনসুর আলি কারণ দিয়েছেন তার 'টাইগারস টেল' বইটিতে :— দেশের মাটিতে নির্জীব উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানরা, বিদেশে প্রাণবন্ত উইকেটে পেস বোলারদের সামনে আর হালে পানি পায় না। যতদিন না ভারতীয় উইকেটগুলি দ্রুতগতি বলের সহায়ক হচ্ছে, ততদিন আমরা ফাস্ট বোলার তৈরী করতে পারব না এবং ব্যাটসম্যানেরাও ফাস্ট বোলিং-এর মোকাবিলায় ব্যর্থ হবে।

আমাদের ফাস্ট বোলারের চমকপ্রদ সাফল্যের কথা বলতে গেলে ১৯৩২ লর্ডস টেস্টের প্রসঙ্গ প্রথমেই মনে পড়বে।

সাটক্লিফ	ব নিসার	৩
হোমস	ব নিসার	৬
উলী	রান আউট	৯
হ্যামণ্ড	ব অমরসিং	৩৫

এই স্কোরশীট তৈরী হবার মাত্র দশদিন আগে সাটক্লিফ-হোমস ৫৫৫ রানের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই নিসার ওদের প্যাভিলিয়নে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। লাল সিং যখন উলীকে রান-আউট করলেন, ইংল্যাণ্ডের রান তখন ১৯!

এর থেকেও চমকপ্রদ প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ আর একবারই মাত্র ভারতীয় ওপেনিং বোলারের দ্বারা ঘটেছে—১৯৪৬-এ লর্ডসেই আবার।

হাটন	ক নাইডু	ব অমরনাথ	৭
ওয়াশব্রুক	ক মাঁকড়	ব অমরনাথ	২৭
কম্পটন		ব অমরনাথ	০
হ্যামণ্ড		ব অমরনাথ	৩৩

বিশ্বের যে-কোন সময়ের যে-কোন বোলারের স্বপ্নের চারটি উইকেট! ওই চারটি উইকেট অমরনাথ পেয়েছিলেন নিখুঁত পীচে, মাত্র ২৪ রানে, ১৭ ওভার বল করে নয়টি মেডেন নিয়ে। ওয়াশব্রুক ও কম্পটন আউট হন পরপর দুই বলে। হ্যামণ্ড হ্যাটট্রিক বন্ধ করেন। চারটি উইকেট পড়েছিল ৭০ রানে। চির-কালের বিশ্ব একাদশে এই চারজনের মধ্যে তিনজন তো নিশ্চয়ই আসবেন। অমরনাথের মত এমন কৃতিত্ব আর কয়েক মাস পরই ব্রিসবেনে দেখান সম্ভব হয়েছিল কীথ মিলারের। ইংল্যাণ্ডের ৫৬ রানের মধ্যে প্রথম চার ব্যাটসম্যানকে—হাটন, ওয়াশব্রুক, এডরিচ ও কম্পটন—মিলার আউট করেন।

১৯৬৯-এ টেস্ট ম্যাচ চলাকালে, বিশ্বনাথের ব্যাটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল লালা অমরনাথের সঙ্গে। বললাম, "ছেচল্লিশের ভারতীয় দলে যদি বিশ্বনাথকে স্থান দেওয়া হত, তাহলে দলের কেউই ভ্রূ কুঁচকে বলত না 'এ আবার কে?' এখন পর্যন্ত, ভারতের সেরা টেস্ট দল হিসেবে কি ছেচল্লিশের দলকেই আপনার মনে হয় না?"

অমরনাথ হাসলেন বটে কিন্তু কথাটা যেন মনঃপূত হল না। বললেন, "আটচল্লিশে যে-দল অষ্ট্রেলিয়ায় গেছল, সেই দলই বা সেরা নয় কেন? তখনকার অষ্ট্রেলিয়া টেস্ট দলের অন্তত দশজন অনায়াসে বিশ্ব একাদশে স্থান পাবার যোগ্য ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি খুব খারাপ খেলেছি?"

১৯৪৭-৪৮-এর অমরনাথের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের অষ্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্টে একবারও শত রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ স্থাপন করতে পারেনি। ব্রাউন, বার্নেস ও মরিস ব্যাটিং-নৈপুণ্যের তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। অথচ মাঁকড় ও সরবটে প্রথম উইকেটে ১২৪ রান তুলেছিলেন লিণ্ডওয়াল, মিলার ও জনস্টনের বিরোধিতা তুচ্ছ করে। এই সিরিজে ভারতের এক নম্বর বিনু মাঁকড় দুটি শতরান করেন এমন আক্রমণের বিরুদ্ধে যার সমপর্যায়ী প্রারম্ভিক আক্রমণ টেস্ট ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। ১৯৫২ লর্ডসে তাঁর ১৮৪-র মত ইনিংসের জুড়ি মেলাও যেমন ভার হবে।

বিনু মাঁকড়ের পর পঙ্কজ রায়, নরী কণ্ট্রাক্টর, জয়সীমা, সরদেশাই, গায়কোয়াড, কুন্দরন, এঞ্জিনীয়ার এবং আরো অনেকের পর বিনুর ছেলে অশোক অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৯-এ চারটি টেস্টে ছ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে কানপুরে ও দিল্লীতে ৬৮, ৬৪, ৯৭, ৭ করার পর ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যানের পরীক্ষা-কেন্দ্র কলকাতা ও মাদ্রাজে ৯, ২০, ০, ১০ করে। কলকাতায় ওঁর ব্যাটিং দেখে লালা অমরনাথকে বলতে শুনি, "ভারতের সর্বকালের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও সিলেকসন কমিটির চেয়ারম্যান বিজয়

মার্চেন্টের উচিত, অশোককে নেটে নিয়ে গিয়ে, কিভাবে সুইং খেলতে হবে দেখিয়ে দেওয়া।"

অমরনাথের পর হাজারে, ফাড়কর, রামচাঁদ, উমরিগড়, দিভেচা, রঞ্জনে, সুরেন্দ্রনাথ, দেশাই, জয়সীমা, আবিদ আলি এবং আরো অনেকের পর লালার ছেলে মহীন্দর টেস্ট খেলেছে, ১৯৬৯-এ মাদ্রাজে। স্পিনারদের উইকেটে বোলারদের দখল-করা মোট ৩৮ উইকেটের মধ্যে (প্রসন্ন ১০, ম্যালেট ১০, বেঙ্কট রাঘবন ৬ উইকেট) মহীন্দর দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার ১২ রানের মধ্যে স্ট্যাকপোল ও চ্যাপেলকে বোল্ড করে বাহ্‌বা আদায় করেছিল।

বস্তুত, যে-কারণে নানান দৃষ্টান্তের তালিকা দাখিল করলাম, তা শুধু এই কথাটা বলার জন্য, একদা আমাদের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলার ছিল, কিন্তু গত পনেরো বছর ধরে আমাদের হাতড়াতে হচ্ছে এদের একজোড়া করে পাবার জন্য। কিন্তু এখনো পাইনি। অথচ অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন স্পিন বোলার প্রচুর পেয়েছি, কারণ নিশ্চয়ই উইকেটের আনুকূল্য। ফাস্ট বোলারদের অনুকূলে উইকেট তৈরী করাটা আমাদেরই হাতে। কিন্তু সে হাত কেন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোঝা যাচ্ছে না। বছর-পাঁচেক টেস্ট খেলা বন্ধ করলে বোধহয় আমরা আবার ওপেনিং বোলার ও ব্যাটসম্যান তৈরীতে মন দিতে পারব।

□ একদা আমাদের ক্রিকেটে ষ্টাইল ছিল □

"আমি যদি ভারতীয় অধিনায়ক পতৌদির নবাব হই তাহলে ব্রায়ান ক্লোজ যে পদ্ধতিতে খেলা জেতে তার বদলে বরং রঞ্জির আত্মা খুশি হন এমন ভঙ্গিতে হারতেও রাজী।"

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি ১৯৬৭-তে নেভিল কারডাসের একটি বক্তৃতার অংশ। এরপর ভারত টানা সাতটি টেস্ট ম্যাচে হেরে যায়। ১৯৭৪, ডিসেম্বরে কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের আগে আমরা টানা পাঁচটি টেস্ট ম্যাচে হেরেছি। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে, হয় আমরা রঞ্জির কথা ভুলে গেছি অথবা রঞ্জি-র মত খেলতে গিয়েই হারছি—এই দুটি সিদ্ধান্তের কোন একটিতে আমাদের আসতে হয়। ১৯৬৭ থেকে আজ পর্যন্ত ৩৭ টেস্ট ম্যাচ খেলে আমরা ৯টি জিতেছি এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যক হেরেছি। হারগুলি রঞ্জির আত্মাকে খুশি করার মত ভাবে ঘটেনি।

রঞ্জি যে সময়ের ইংল্যাণ্ডে খেলা শিখেছেন ও খেলেছেন সেই সময়ে সর্বাধিক জোর দেওয়া হতো স্টাইলের বুনিয়াদি গুণগুলির প্রতি। স্টাইল বলতে এক্ষেত্রে শুধুই প্রকাশিত ক্ষমতার সৌন্দর্য বা কান্তিকেই বোঝায় না (যদিও এক অর্থে কথাটা অবশ্য সেইভাবেই ব্যবহৃত হয়)। যন্ত্রবৎ আয়ত্ব করে নেওয়া সঠিকত্বের উপর নির্ভরশীল যে খেলা তার নিছক উপযোগিতা মূল্যকেই এখানে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ কলকব্জারই মত শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে সব নিয়মাদির দ্বারা যন্ত্রবৎ কাজ করে তার প্রতি অনুগত থাকা।

ক্রিকেটে সফলভাবে অঙ্গাদিচালনাকে কাজে লাগাতে হলে নিয়ম মানতেই হবে। 'বাম কনুই যতটা সম্ভব এগিয়ে' বা 'কখনো ডান পা নড়াবে না' এই সব নিয়ম সব সময় মেনে যিনি খেলেন নিশ্চয় তিনি স্টাইলিস্ট নন, কিন্তু সময় আসে যখন প্রয়োজনে ওই-ভাবেই খেলতে হয়। রঞ্জির আমলে স্বচ্ছ স্বাধীনভাবে ওস্তাদের মতই ব্যাট চালনা হতো সামনের দিকে এবং নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গিতে ফরওয়ারর্ড ডিফেনসিভ খেলাও। অফ স্টামপের বাইরে গুডলেংথ বলে তারা অফ ড্রাইভ করতেন, পারতেন কাট করতে। আক্রমণ করতেন বোলিংকে। তাঁরা আউট হয়ে যাবার জন্য খেলতেন না, স্ট্রোক দেবার জন্য যতটা শারীর সঞ্চালন প্রয়োজন ততটা ব্যবহারে কার্পণ্য করতেন না। তাঁরা লেগে বল পেটাতেন, হাফ-ভলি বল তারা পিছিয়ে খেলতেন না, শক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্রিকেটের সনাতন সংস্কারগুলি মানতেন। আবার নিয়ম ভাঙ্গতেও ইতঃস্তত করতেন না। নির্দিষ্ট স্ট্রোকের কোন এক বিশেষ মূহূর্ত ছাড়া, 'বাম কনুই' বা 'অনড় ডান পা' অগ্রাহ্য করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না।

রঞ্জির আমলে বা রঞ্জি নিজেও, যখনই খেলতে নামতেন, এইটুকু অন্তত মনে রাখতেন তাঁকে রান করতেই হবে এবং মাঠের রসজ্ঞ দর্শকরা তার কাছে এই আশাই করছেন। তাই নয়, ভাল খেলার গ্রাহ্য রীতি-নিয়ম অনুসারে এমনভাবে রানগুলি করতে হবে যাতে সবাই তারিফ জানিয়ে বলতে পারে 'চমৎকার স্টাইলে'। কেউ যদি ৬০ রান খারাপভাবে করে তাহলে সে নিজেই মরমে মরে যেত, কেউ তাকে তারিফও জানাতো না। আত্মসম্মান বোধ ও সুনাম রক্ষাই তখন ক্রিকেটারদের কাছে বড় কথা ছিল।

এখন ব্যাটের বাইরের বা ভিতরের কাণায় লাগা বল থেকে স্লিপের মধ্য দিয়ে বা ফাইন লেগে রান কুড়িয়ে আনতে ব্যাটধারীরা লজ্জা পান না। দর্শকরাও আহ্লাদে আটখানা হন। অনিচ্ছাপ্রসূত ও

লক্ষ্যভ্রষ্ট স্ট্রোক বা স্ট্রোকবিহীনতার দ্বারা অধিকাংশ রান পেয়ে শত রান করা ব্যাটধারী নায়কের মর্যাদা পান। রঞ্জির আমলে আপাত-নান্দনিক এক ধরনের নৈতিকবোধ উচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে ছিল। 'করবই, যেহেতু করতেই হবে'—স্টাইলের সঠিকত্ব সম্পর্কে এই রকম মনোভাব প্রত্যেকে পোষণ করতেন। এখন এই মনোভাব নেই। এখন ক্রিকেটারের যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড প্রয়োজন সে কতটা মেটাতে পারে। কথাটা বারবার আমরা ভুলে যাই, স্টাইলের এই যে সনাতন প্রয়োগরীতি সেটাই টেকনিকের সঠিকত্ব রক্ষা করে এমনকি উপযোগিতামূলক সাফল্যকেও।

এইবারের সিরিজে কানিতকার প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন। লজ্জায় মাথাকাটা যাবার মত রানগুলি। কিন্তু রানগুলির দরকার ছিল তাই দ্বিতীয় টেস্টেও তাকে রাখতে হল। বয়েসের শর্টপীচ বলে ব্রিজেশ প্যাটেল বাঙ্গালোরে উবু হয়ে পড়ল, বল ভাগ্যক্রমে তার মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বেদনাদায়ক দৃশ্য। ভিজে পীচে বল লাফাতে পারে, খেলার আগেই এই চিন্তায় বশীভূত ব্রিজেশ দিল্লীতে বোলারের হাতে ক্যাচ তুলে দিল। এনজিনীয়ার অমার্জিত কুরুচিকর স্ট্রোকে ব্যাটিং-এর মৌল নিয়মকানুন লঙ্ঘন দ্বারা পতন ঘটালো নিজের এবং ক্ষতিগ্রস্ত করল দলকে। বিশ্বনাথ বারবার তিরিশ-চল্লিশের মধ্যেই আটকে যাচ্ছে স্থৈর্য ও আকাঙ্ক্ষার অভাবে, যা তাকে অভিজাত পংক্তিতে উঠতে দিচ্ছে না। গাভাসকার, যার মেজাজ ও ভঙ্গি ক্লাসিকাল রীতিতে গড়া, তাকেও বিশৃঙ্খল হতে দেখা গেল। এবং পতৌদি, ইংরাজী ঘরানার ক্রিকেটার, যার ক্রিকেট শিক্ষা বিলেতের মাঠে, ক্রিকেটের সনাতন বোধ ও সংস্কার যে শুষে নেবার সুযোগ পেয়েছে, বাঙ্গালোরে তার একমাত্র ইনিংসটির দীনতা, অপ্রতিভতা হয়তো তার নিজের কাছেও পীড়াদায়ক হয়েছে। যদি তার আঙুলে আঘাত না লাগতো, আমার ধারণা তাহলে সে ইচ্ছা করেই দেহে

কোথাও আঘাত গ্রহণ করে ক্রিকেট মাঠ থেকে সরে যেত লজ্জা ঢাকতে।

বোলিংয়েও রঞ্জির আমলে সনাতন স্টাইলই, সূক্ষ্মতা ও লেংথ-এর উপর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্বই প্রাধান্য পেত। মাঝে মধ্যে ভুল করে ওভারপিচ বল হয়ে গেলেও শর্ট বল ছিল গুরুতর অপরাধ। খারাপ বল পেলে তবেই মারবো, কোন ব্যাটধারী যদি এইভেবে ব্যাট করতে নামতেন, তাহলে হয়তো ব্যর্থ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ক্রিজে আসতেন। খারাপ বল আদৌ হয়তো পাবেনই না। টেকনিকের মান, আদর্শ ছিল উচ্চ এবং সেই উচ্চতায় হয়তো সর্বদা পৌঁছানো সম্ভব হত না, কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করা হতো। বোলিং-এ সাবেকি আদর্শের বড় রকমের ক্ষতি প্রথম হয় ১৯০৭-এ যখন দক্ষিণ আফ্রিকার লেগব্রেক ও গুগলি বোলার দ্বারা ইংল্যাণ্ড আক্রান্ত হল এবং তাদের অসম্ভব সাফল্য আগামী দিনের স্পিনারদের যুগ শুরু করল। দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯০৭ ও ১৯১২-র বোলাররা শুধু স্পিনেই ওস্তাদ ছিল না, নিখুঁততে ও চাতুর্যেও ছিল পটু। তাদের অনুকরণকারীরা জোর দেয় চাতুর্যে, নিখুঁত হবার দিকে নজর কম দেয়। নিখুঁত হওয়ার যে কত দরকার চন্দ্রশেখরের বোলিং হিসাবের পাশে গ্রিমেটকে রাখলেই বোঝা যাবে। টেস্ট বোলিং ইতিহাসে গ্রিমেট একটি পরিচ্ছেদ পাবে, চন্দ্রশেখর কয়েকটি পংক্তিমাত্র।

'সুইং' ও 'সোয়ারভ' বোলিং এখনকার ক্রিকেটে অবশ্য ব্যাপার। কিন্তু কজন পারে নিখুঁত লেংথ রাখতে? লেংথ-এর পতন ঘটার সঙ্গেসঙ্গেই সেই প্রাচীন ও অমূল্য আদর্শটিও নেমে গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার স্পোফোরথ তার বোলিং সাফল্যের প্রথম আমলেই বেসবল পিচিং থেকে ধারণা পেয়ে, 'সোয়ারভ' নিয়ে মাথা ঘামান এবং বাতাসে বলের গতিপথ বাঁকাবার পন্থাও বার করে ফেলেন। ব্যাপারটা আয়ত্ত করেই তিনি তা ছেঁটে ফেলে দেন যেহেতু সোয়ারভ করাতে গিয়ে প্রায়শই তার বোলিং লেংথ হারাচ্ছিল।

সর্বকালের অন্যতম চমৎকার বোলার, এই সেরা শিল্পী লেংথ হারাতে রাজী হননি।

স্টাইল আমরা নিশ্চয়ই হারিয়েছি হকির মত ক্রিকেটেও। পঙ্কজ রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ক্রিজে থেকে বোম্বাইয়ে ১৫ বছর আগের ডিসেম্বরে, ৯০ রান করেছিলেন গিলক্রিস্ট, হল, অ্যাটকিনসন, রামাধীন, সোবার্স ও স্মিথের বলে। ৩৯৯ রান তুলে জেতার জন্য আলেকজাণ্ডার ভারতকে সাড়ে ন ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। ভারত মাটি কামড়ে থেকে ৫ উইকেটে ২৮৯ রান করেছিল। টেকনিক অর্থাৎ যে সঠিকত্ব যন্ত্রের মত, যা সনাতন রীতি অনুসারী তা আয়ত্তে না থাকলে আধুনিককালের অন্যতম ভয়ঙ্কর আক্রমণের সামনে সাড়ে ন ঘণ্টা কোন দল টিঁকে থাকতে পারত না। সহজে যিনি প্রশংসা করেন না, সেই ডন ব্র্যাডম্যানের মনে রেখাপাত করে অষ্ট্রেলিয়ায় বিজয় হাজারের খেলা, তার—'সাউণ্ডনেস অ্যাণ্ড দ্য করেক্টনেস অফ হিজ স্ট্রোক প্রোডাকসন' এর জন্য। অ্যাডিলেডে হাজারের ১১৬ ও ১৪৫ হয়েছিল লিণ্ডওয়াল, মিলার, ম্যাককুল, জনসন ও টোসাকের বলে। এই করেক্টনেস বা সঠিকত্বের সেরা নিদর্শন ইডেনে দেখেছি দুই কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে হাজারের ব্যাট থেকে। বিশ্বের সর্বকালের সেরা স্পিনারদের একজন জর্জ ট্রাইবের চায়না-ম্যান ও গুগলির সঙ্গে একক যুদ্ধে হাজারের অপরাজিত ১৭৫ বা পরের মরশুমে ট্রাইব, রামাধীন ও ডুলাণ্ডের বল থেকে ১৩৪ রান (বিশ্বাস করুন, ডুলাণ্ডের বলে একটি ছয়ও!) চিরকাল ইডেনের দুটি সেরা ইনিংস হয়ে থাকবে।

সনাতন বুনিয়াদি স্টাইল থেকে ভারতীয় ক্রিকেট সরে গেল ১৯৫৮-৫৯ মরশুমে ওয়েষ্ট ইনডিজ দলের ধাক্কায়। তারা ধাঁধিয়ে দিল ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। আমরা নকল করতে গেলাম নিজেদের সহ-জাত দক্ষতা ভুলে ও স্টাইল আয়ত্ত না করে। কুন্দরন, জয়সীমা, এনজিনিয়ার প্রভৃতিরা কখনো কখনো রানও পেলেন। ব্যাটিং

সহায়ক মন্থর ভারতীয় উইকেটও আলস্য এনে দিল আমাদের ব্যাটধারীদের ভঙ্গিতে এবং চেতনায়। দর্শক মনোরঞ্জন, যেভাবে ফুটবলে হয়, ক্রিকেটে সেভাবে হতে পারে না। কারডাসের কথাই একটু বদলে বলা যায়, একটি ফুটবল ম্যাচ শুরু ও শেষ হতে যে সময় নেয়, ততক্ষণ সময় বিজয় হাজারের লাগে থিতু হতে। ক্রিকেট প্রথম শ্রেণী পর্যায়ে কখনোই প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে না। একদিনের ম্যাচ অবাস্তবই নয়, ক্ষতিকরও।

ষাটের দশকের উত্তেজনালোভী নবীন দর্শককুলের চিত্তবিনোদন করতে তৃতীয় শ্রেণীর বহু ব্যাটধারীই আমাদের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আশ্রয় পায় সহজ উইকেটের আনুকূল্যে। এরা জানে একবার কোনক্রমে ৫০ বা ৬০ রান করলে পরের তিনটি ম্যাচেও খেলার সুযোগ পাবে। এদের উত্তরাধিকারীরাই এখন আমাদের টেস্ট দলকে আলোকিত করছে। এরা স্টাইলের বুনিয়াদি গুণগুলি রপ্ত করেনি। করলে লয়েডের বোলারদের কাছে নতজানু হতো না। আমাদের বোলাররা প্রাণভিক্ষা করত না। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটিং আপাতদৃষ্টে মনে হয় প্রকৃতি বিরোধী, রীতি বহির্ভূত, সনাতনপন্থার বাইরে। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রত্যেকের ব্যাটিং ক্রিকেট নিয়মের মৌল গুণগুলির প্রতি আনুগত্য মেনেই তার উপর দাঁড়িয়ে ঝলসে ওঠে। আমাদের ব্যাটধারীরা এই ঝলসে ওঠাটুকুই নকল করেছে মাত্র। একদা ব্র্যাডম্যানের দুরন্ত একটি শত রান দেখার পর আরচি ম্যাকলারেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডনের ব্যাটিং সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে ম্যাকলারেন বলেন, 'এমন ব্যাটিংয়ের কাণাকড়ি দামও দেব না।'

ম্যাকলারেন বড় খেলোয়াড়কে চিনে নিতে পারেন। আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন : 'অকল্পনীয় ব্যাটিং। কিন্তু আমি যে স্টাইলের উপর আমার নিজের বিরাট খেলা গড়েছি, তার নিয়ম ডন মানেনি।'

ডন কি সত্যিই বেনিয়মী না আপাতদৃষ্টে তাই মনে হয়? আপাতদৃষ্টেই মনে হয়, নতুবা প্রায় সাত হাজার রান, ৮০ টেস্টইনিংসে কি সম্ভব?

□ ক্রিকেটকে মুক্তি দেওয়া হোক □

১৯৬২-র এক সন্ধ্যায়, গোলদিঘির চাতালে বসে মার্কিন কবি অ্যালেন গীনসবার্গ, মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেসবল খেলা সম্পর্কে আমাকে মোটামুটি ধারণা করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁকে ক্রিকেট বোঝাতে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অসহায়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম, অসম্ভব কাজ। ক্রিকেট সর্ব অর্থেই কঠিন। এই খেলার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যে লালিত হয়নি, তার কাছে ক্রিকেট বরাবরই ধাঁধা হয়ে থাকবে।

ক্রিকেট ব্যাপারটা কি ও কেমন, অন্য যে কোন খেলায় ওয়াকিবহাল বিদেশীকে তা বোঝাবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কোন এস্কিমোকে পাণিনির ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার থেকে কাজটা সহজ হবে না। আপনার বক্তৃতা শেষে শ্রবণকারীর এই প্রত্যয়ই হবে, এই খেলা ইংরাজদের বিকৃত মনের আর একটি নমুনা, একাধারে বিরক্তিকর এবং খানিকটা পাগলামিও। তারপর সে ভাববে, যা খেলতে কয়েকদিন সময় লাগে এবং তাতেও হয়তো চূড়ান্ত ফল পাওয়া যাবে কিনা নিশ্চয়তা নেই, এমন খেলা অতি বৃহৎ এবং অতি বিদঘুটে কোন সভ্যতার দ্বারাই একমাত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব। গত বছর কলকাতায় সোভিয়েত টেনিস খেলোয়াড় মেত্রিভেলিকে আতঙ্কে শিহরিত করেছিলাম এই প্রশ্নে : "ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলা দেখেছ ? কেমন লেগেছে ?" জবাব দিয়েছিলেন, "ডাল, বোরিং........ অলস লোকেদের জন্য।"

অথচ কয়েকলক্ষ লোক কলকাতায় একটি টিকিটের জন্য পাগল

হয়ে যান, যখনই টেস্টম্যাচের পদধ্বনি শোনেন। তাদের মধ্যে আমিও অন্যতম। ক্রিকেট খেলা দেখতে চাই, অবশ্যই আগ্রহে; কিছুটা নেশায়; খানিকটা জুড়িয়ে নেবার জন্য এবং ব্যতিব্যস্ত জীবনের চাপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে। মাঠে সর্বাগ্রে কাম্য বোদ্ধা রসিকদের সঙ্গ। যদি এসব না পাই ক্রিকেট সাহিত্য পড়ি।

চাপল্য হচ্ছে মনে করলে আমি নিরুপায়। এই মর-জাবনের বিরক্তি, উদ্বেগ হতাশা থেকে উপশমকারী যে কোন উপায় সংগ্রহের অধিকার সকলের মত আমারও আছে। সেই উপায়গুলির অধিকাংশের থেকে কম ক্ষতিকর ক্রিকেট খেলা দেখা। ইংল্যাণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মাঠে দর্শক কমে গেছে। ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তানের মাঠ ভীড়ে ভেঙ্গে পড়ে। কারণটা সম্ভবত, ক্রিকেট সৃজিত হয়েছিল সরল, মন্থর, অপ্রাচুর্যের যুগে। তাই ক্রিকেট আমাদের টানে। এই টান যখন আর অনুভূত হবে না, এই খেলাও তখন আর বাঁচবে না।

ক্রিকেট সত্যিই কঠিন ব্যাপার। অন্য খেলা তারিফ করতে যতটা জ্ঞান লাগে, ক্রিকেট লাগে তারও অনেক বেশী। ফুটবল বা টেনিসের প্রধান তত্ত্ব এবং মূল কৌশলগত ধারণাটুকু একজন তিব্বতীকে আধঘণ্টা বা তার কম সময়েই ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে (বিশ্বের এক নম্বর খেলা হিসাবে ফুটবলের প্রাধান্যের কারণ, এর অতি সরলতা)। বেসবল বা রাগবী জটিল হলেও অধিকাংশের বোধের কাছে অনধিগম্য নয়, কিন্তু ক্রিকেট থেকে রস আহরণ করতে হলে, কোন না কোন স্তরের ক্রিকেট তাকে খেলতেই হবে। খুব ভাল খেলতে হবে, এমন কথা বলছি না, তবে যেভাবে যতটুকুই খেলুন মন দিয়ে খেলতে হবে।

এমন লোক দেখেছি, যিনি উইজডেনের পাঁজির কোন্ পাতায় কি লেখা আছে বলে দিতে পারেন, কিন্তু ইয়র্কার বল কোথায় পড়ে

বলতে অক্ষম। এঁরাই হচ্ছেন সেই লোক, যাঁদের সঙ্গ বিদ্যুত-গতিতে ত্যাগ করা উচিত। সম্পূর্ণ অজ্ঞতা অনেক সহনীয়, এই ধরনের পাণ্ডিত্যের থেকে। প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জ্ঞানের পুঁজি যদি থাকে, তাহলে সময় কাটাতে ক্রিকেটের থেকে লাভজনক আর কিছু আকাশতলে আছে কিনা জানি না। কোন খেলা সম্পর্কেই এত কথা, এত লেখা হয়নি, যা হয়েছে ক্রিকেটকে ঘিরে। এর একাধিক কারণও আছে। তার মধ্যে একটি কারণ টেকনিক্যাল। ক্রিকেটের প্রতিটি বল এক একটি বিযুক্ত ঘটনা। সেজন্য প্রতিটি বল ধরে খেলাটির আলোচনা করা যায় এবং ইতিহাসের সারিবদ্ধ ঘটনার মত মনে রাখাও যায়।

তুলনা করুন ফুটবলকে। অসাধারণ দর্শনযোগ্য খেলা। কিন্তু প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক। বিযুক্ত, পারম্পর্যহীন ঘটনা প্রায় নেই-ই। পিছনের দিকে তাকিয়ে কোন ফুটবল ম্যাচকেই আর আকর্ষণীয় করে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করানো যায় না, যেমন, ঠিক একই কারণে বিমানযুদ্ধের সম্পর্কে আকর্ষণীয় করে কিছু লেখা অসম্ভব ব্যাপার। যে কোন খেলা, যদি সাহিত্য রচনার প্রেরণা হতে চায় তাহলে তাকে আলাদা আলাদা ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠতেই হবে। তাহলেই সর্বপ্রথমে ক্রিকেট এবং তারপর গলফ ও বেসবল ছাড়া আর কোন খেলা খুঁজে পাওয়াই দায় হবে। ক্রিকেট কল্পনাপ্রবণ মনকে যতটা মুঠোয় ধরেছে, সেভাবে আর কোন খেলা পারেনি। সেই মুঠো কি এখন শিথিল ?

ক্রিকেটের নানারূপ বিকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। ১৯৩৯-এ ইডেনে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে প্রথম ইনিংসে বাংলার ২২২ রানের জবাবে পরাজিত দক্ষিণ পাঞ্জাবের উজীর আলি একাই করেছিলেন অপরাজিত ২২২ (ইনিংসের ৬৭%)। পরবর্তী সর্বোচ্চ রান ২০! এরপর আর কোন রঞ্জি ফাইনালে ব্যক্তিগত শৌর্যের এমন প্রকাশ আর ঘটেনি।

যা কিছু বিকাশ ঘটেছে তার অনেকটাই কুশলতার দিকে—কয়েক ধরনের বোলিংয়ে এবং নিঃসন্দেহে ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে। সন্দেহ নেই এই সব বিকাশে নঞর্থক ফলই দেখা দিয়েছে। যেমন, খেলা দেখতে এখন আগের থেকে অনেক বিরক্তি লাগে এবং হয়তো এরই ফলপরিণতি ঃ কল্পনাপ্রবণ মনের কাছে ক্রিকেটের আবেদন হারানো। ইনিংসের শুরুতে নতুন বল হাতে লোকটিকে দেখামাত্র জেনে যাই এবার কি দেখব। তখনই দমে যাই। একপ্রান্তে লোকটি অযথা দীর্ঘপথ দৌড়ে এসে মিডিয়াম পেসে বল দেবে লেগসাইড ফিল্ডের কথা মনে রেখে ; অন্যপ্রান্তে ঠিক এই রকমেরই একটি লোক, ঠিক এই রকমেরই বল করবে। এই হচ্ছে ক্রিকেটের বিকাশ! সৌভাগ্যের কথা, এবম্বিধ বিকাশলাভের আগেই স্কুল পালিয়ে লালা অমরনাথের ২৬২ রানের ইনিংসটি ইডেনে দেখে ফেলেছিলাম। ১৯৪৬-এর শেষার্ধে—তৃতীয় উইকেটে রুশি মোদি ও অমরনাথের ৪১০ রান (বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম তৃতীয় উইকেট পার্টনারশিপ) এবং বল করেছিলেন, পুঁটু চৌধুরী, দাত্তু ফাড়কর, ফজল মামুদ ও গিরিধারী।

সবরকম খেলাতেই, রক্ষণাত্মক কৌশলের প্রাধান্য খুবই স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যাপার। উদ্ভাবনী মন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ টেকনিক, চেষ্টা করলেই ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যকে স্তিমিত করেদিতে পারে—এটা দুঃখের কথা কিন্তু জীবনে তো এইরকমই দেখা গেছে। চীনা ও জাপানীরা আসার আগে টেবলটেনিসেও তাই ঘটেছে। আশ্চর্যের কথা এই ধরনের নঞর্থক বিকাশ ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম আমলে কিন্তু দেখা যায়নি। মনে হয় দুটি ব্যাপারে এই জিনিস ঘটেছে ; ইনসুইং এবং অফ থেকে ঢুকে আসা বলের ব্যবহার ও তার প্রাধান্য এবং লেগ সাইড ফিল্ড সাজানোর কৌশলের জন্য। উইকেটের ক্রমাবনতিও অন্যতম কারণ। গত ৭-৮ বছর ইডেনে যা উইকেট দেখেছি, তাতে পুরানো ধাঁচের অফ-সাইড নির্ভর ফিল্ড সাজিয়ে যদি

অমর সিং, অমরনাথ, ফজল মামুদ, পুঁটু চৌধুরী এমন উইকেটেবল করতেন তাহলে কি কাণ্ড ঘটতো ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

তিরিশ বা চল্লিশের দশকে আমাদের বোলাররা ইনসুইং বল করতে জানতেন এবং করতেনও। কিন্তু এটা এখন রহস্যের মত লাগে, তারা সেদিন আজকের এই আধুনিক কৌশল অবলম্বন করে খেলাকে ক্লান্তিকর বিস্বাদে ভরিয়ে দেননি।

এখনকার সমস্যা ক্রিকেটকে কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করার, মুক্তি দেওয়ার। আইনের আশ্রয় নিয়ে ক্রিকেটকে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। এতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয়নি। নির্দিষ্ট সংখ্যক ওভারের একদিনের তাৎক্ষণিক ক্রিকেট ম্যাচ চালু করা হয়েছে। ক্রিকেটকে শিল্পপর্যায় থেকে বিচ্যুত করার এবং একঘেঁয়েমি আনার এই প্রয়াস সম্পর্কে আমার ধারণাটি সম্পূর্ণতই প্রতিক্রিয়াশীলের। চল্লিশ ওভারের ক্রিকেট বিষয়ে কখনো কেউ লিখবে না, কোন খেলা সম্পর্কে পরে কেউ বিমুগ্ধ আলোচনাও করবেন না। কল্পনাবিলাসীর কাছে এর কোন আবেদন নেই।

ক্রিকেট মুক্তি পাক বা না পাক, লক্ষ লক্ষ লোক এখনো এর নামে আন্দোলিত হচ্ছে। আমারই মত : আগ্রহে, সামান্য নেশায়, সান্ত্বনা পেতে এবং ব্যতিব্যস্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে। তাৎক্ষণিক ক্রিকেটকে কেউ মনে রাখবে না। জীবনকে মধুর করার এই উপায়টি থেকে যদি আসক্তিপরায়ণরা ক্রমশ বঞ্চিত হতে থাকে, তাহলে অন্য কোন মাঠে আমাদের যেতে হবে। ঈশ্বর, জীবদ্দশায় যেন সেইদিন না আসে!

□ কোন্‌ নিরিখে 'বিশ্ব শ্রেষ্ঠ' বোলার আখ্যা দেওয়া হয়! □

ওরিলীকে 'বিশ্ব শ্রেষ্ঠ' আখ্যা কে বা কারা দিয়েছিলেন জানি না, তবে ব্র্যাডম্যান অকুণ্ঠে আজও স্বীকার করেন, যেসব বোলারদের পক্ষে বা বিপক্ষে তিনি খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ওরিলীই 'গ্রেটেস্ট বোলার'।

বস্তুত একবার নেভিল কারডাসের সঙ্গে ব্র্যাডম্যানের এই ব্যাপারে তুমুল তর্কও হয়ে যায়। সার নেভিল বলেন—সিডনী বারনেস; সার ডোনাল্ড বলেন—ওরিলী। তাঁর মতে, বারনেসের সময় যত রকম বল ছিল, সে-সবের উপর ওরিলীর কর্তৃত্ব তো ছিলই —উপরন্তু হাতে ছিল 'গুগলি'। এই কথা শুনে বারনেস বলেন, "ঠিক কথাই, আমি কখনো গুগলি বল দিইনি।" তারপর চোখে চাপা হাসি নিয়ে যোগ করেন, "তার দরকারও আমার হয়নি।" এটি ক্রিকেটের বহু ক্লাসিক গল্পের একটি। অনেকেই জানেন।

কিন্তু কি কি যুক্তির ভিত্তিতে একজন বোলারকে চিরকালের 'বিশ্ব শ্রেষ্ঠ' আখ্যা দেওয়া হয়? আমার দৃঢ় ধারণা, এ সম্পর্কে প্রমাণসিদ্ধ মতপ্রকাশের মতো উপযুক্ত গুণান্বিত লোক, পৃথিবীতে একজনও নেই। কেউ হয়তো বড়জোর নির্দিষ্ট কোন আমলের বোলারদের সম্পর্কে কিছুটা প্রত্যয় নিয়ে রায় দিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘ সময়কাল যদি ধরা হয়, তাহলে পুরোপুরি নির্ভুল তুলনা একদমই অসম্ভব, একাধিক কারণে।

প্রথমেই বলা যায়, এককালের বোলারের সঙ্গে অন্যকালের তুলনা করতে গেলেই নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রিকেটের

ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রিকেট এগিয়েছে—বলের আকার ছোট করা হয়েছে, স্টাম্পগুলি বড় করা হয়েছে, বোলারদের অনুকূলে এল বি ডবল্যু আইনটির সংস্কার হয়েছে। ওভার পিছু বলের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে এবং তার দরুন ফলাফল ভাল না মন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন, ওভার দীর্ঘ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফাস্ট বোলাররা, এতে তাদের দমের উপর বেশি চাপ পড়েছে।

এক সময় বৃষ্টিতে, পীচ উন্মুক্ত রেখে বোলারের দৌড়ের পথটি শুধু আবৃত রাখা হত। এর ফলে ভিজে উইকেটে ফাস্ট বোলার প্রয়োগের ব্যাপারে রীতিমত আলোড়ন ঘটে যায়। যদি গোটা অঞ্চলই অনাবৃত থাকে এবং জোর বৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে পিছল জমিতে ছোটার অসুবিধার জন্য ফাস্ট বোলাররা ভালভাবে বল করতে পারেনা। সেক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান খতম করার দায়িত্ব পড়ে স্পিন বোলারদের কিংবা মিডিয়াম পেসারদের উপর। স্কোরবুকে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে। ১৯৩৬-৩৭-এ ব্রিসবেনের বৃষ্টিভেজা 'স্টিকি' উইকেটে ভেরিটির মত বোলার একবারও বল করার সুযোগ পাননি। অথচ সে সময় 'ষ্টিকি' উইকেটে তিনি সব থেকে ভয়ংকর বোলার হিসাবে গণ্য হতেন। ইংল্যাণ্ডের দুই ফাস্ট বোলার, অ্যালেন ও ভোস মাত্র বারো ওভারে সেদিন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে দেন ৫৮ রানে। হয়তো তখন ভেরিটি, ১৯৩৪-এ লরডসের দ্বিতীয় টেস্টে, একদিনে অস্ট্রেলিয়ার ১৪টি উইকেট পাওয়ার কথাই ভাবছিলেন!

এখন উইকেট আবৃত রাখা হয়। এতে ব্যাটসম্যানরা নিঃসন্দেহেই সুবিধা পায় সুতরাং আগেকার আমলের বোলারদের বোলিং হিসাবের সঙ্গে এখনকারদের তুলনা করা উচিত হবে না।

এক সময় একটি মাত্র নতুন বল দ্বারা পুরো ইনিংস খেলা হত। ২০০ রান হলে ফিলডিং পক্ষ আবার নতুন বল নিতে পারবে, এই

নিয়ম প্রথম ইংল্যাণ্ডে চালু হয় ১৯০৭-এ। হিসেব করে দেখা গেছে, ৪৮০ বার বল করলে সাধারণত ২০০ রান হয়। ৫৫ ওভার (ছয় বলের) বল হবার পর ফিলডিংপক্ষ নতুন বল গ্রহণের দাবি জানাতে পারবে, এই নিয়ম চালু হয় চল্লিশের দশক থেকে। এর ফলে ডেলিভারী সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০। পরীক্ষামূলকভাবে ভারতে এখন ৭৫ ওভার অর্থাৎ ৪৫০টি বল হলে নতুন বল নেওয়া যায়।

নতুন বল নেওয়ার এই নিয়ম ট্যাকটিকসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে। নতুন বল নিয়ে যাঁরা বল করেন, সাধারণত তাঁদের প্রবণতা থাকে আক্রমণের দিকে। কিন্তু ব্যাটসম্যানরা যদি বোলিংকে দাবিয়ে কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তাহলে অধিনায়করা পরবর্তী নতুন বল প্রাপ্তি পর্যন্ত রান ওঠার হার কমিয়ে রাখতে রক্ষণাত্মক ফিলডের আশ্রয় নেয়। স্বভাবতই তখন যে সব বোলারদের বলে বেশি রান ওঠে, যেমন ডান হাতের স্লো-লেগব্রেকার, তাদের আর বল করতে দেওয়া হয় না। তখন মিডিয়াম পেসারদের একনাগাড়ে এক-ঘেঁয়েভাবে বল করার জন্য ডাক পড়ে।

আমার মনে হয়, অমুক বোলার 'বিশ্ব শ্রেষ্ঠ' কিনা এই বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে, বরং কিছু বোলারকে ধরে তাদের সেরা গুণাবলীসমূহ নির্ণয় দ্বারা কোন্‌জন তাদের মধ্যে উত্তম, তাই নিরূপণের জন্য মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে জমাট আড্ডার আসর পাতাই বরং ভাল। তবে আড্ডাটি একবারেই মাটি হয়ে যাবে, যদি কোন বোলার সর্বসম্মতিক্রমে (বা ব্যাটসম্যানও) সর্বোত্তম বিবেচিত হয়ে যান।

ব্র্যাডম্যান একবার সার স্ট্যানলি জ্যাকসনের সঙ্গেও ওরিলীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দীর্ঘ তর্ক করেছিলেন। জ্যাকসনের এক কথা— জর্জ লোমান অনেক বড় বোলার ছিলেন বিল ওরিলীর থেকে। তখন দুজনে ওই দুই বোলারকে চুলচেরা বিচার করে মেনে নেন যে, গুণাবলীর দিক থেকে দুজনেই বোধহয় সমান-সমান। কিন্তু

ব্র্যাডম্যান তাঁর প্রার্থীর স্বপক্ষে এই টেকনিক্যাল যুক্তি দেখিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেন যে, লোমান অফ ব্রেক দিতেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কিন্তু ওরিলীর অফব্রেক ছিল বেশির ভাগই গুগলি, ব্যাটসম্যানেরা যা প্রায়ই লেগব্রেক ভেবে ঠকতেন। সার স্ট্যানলি অবশ্য ব্র্যাড-ম্যানের এই যুক্তিটি গ্রাহ্য করেন নি।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, তাকেই বড় বোলার বলব যিনি অল্প আয়াসে বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কৃতিত্বের মান কিসের ভিত্তিতে ধরা হবে, তাই নিয়ে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। তর্কের খাতিরেই বরং ধরা যাক—টেস্টে ১০০ উইকেট। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, বেশ কিছুসংখ্যক বড় বোলার যারা টেস্টে ১০০ উইকেট পাননি, এর ফলে বাদ পড়ে যাচ্ছেন। অসুস্থতা বা মৃত্যু বা এমন কোন ব্যাপার যার সঙ্গে নৈপুণ্যের কোন সম্পর্ক নেই, এমন নানান কারণে হয়তো তাঁদের খেলার জীবন অকালেই শেষ হয়ে গেছে। যেমন অমর সিং মাত্র সাতটি টেস্ট খেলে ২৮টি উইকেট নেওয়ার পরই মারা যান মাত্র সাড়ে উনিত্রিশ বছর বয়সে। সম্প্রতি সার লিওনারড হাটন ভারতে এসে বলে গেছেন, "অমর সিং তাঁর সময়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর ধরনের বোলারদের মধ্যে।" অবশ্য হাটন একথাও স্বীকার করেছেন, তিনি যেসব বড় বড় বোলারদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তার মধ্যে সেরা লিনডওয়াল, মিলার এবং ওরিলী। অসট্রেলিয়ার ফাসট বোলার, এবং অন্যতম বিশ্বশ্রেষ্ঠ, টেড ম্যাকডোনালড ১৯২১ টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২৭টি উইকেট নেওয়ার পরই দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যান, পেশাদার ক্রিকেট খেলতে। তিনি মোট ১১ টেস্ট খেলে ৪৩ টি উইকেট পান।

কৌতূহলবশত রেকর্ড বই খুলে দেখছিলাম, কোন ইংরাজ বোলার এক মরশুমে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন। তালিকায় সর্বোচ্চ এগারোটি স্থান ৩০৪ থেকে ২৫৩ উইকেট সংখ্যার মধ্যে।

তার মধ্যে 'টিচ ফ্রিম্যান' শুধু তালিকা শীর্ষেই নয়, এগারোটি স্থানের মধ্যে তিনি দখল করে আছেন (১৯২৮-১৯৩৩) ছয়টি। তাৎপর্যময় যে, বাকি পাঁচটি স্থানে রয়েছেন : টম রিচারডসন (১৮৯৫ ও ১৮৯৭), টারনার (১৮৮৮), জ্যাক হিয়ারন (১৮৯৬) এবং উইলফ্রেড রোডস (১৯০০)। উক্ত কৃতিত্বসমূহের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীরগুলি অর্জিত ছয় বলের কম ওভারে।

এখন ফ্রিম্যানকে কি সতিকারের বড় বোলার হিসাবে ধরা হবে? ইংলিশ কাউনটি ক্রিকেটে অবশ্যই ধরা হবে, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে ওর স্থান নেই বললেই চলে। মাত্র ১২টি টেস্ট খেলে ৬৬ উইকেট পেয়েছিলেন। ওঁর এত উইকেট পাওয়ার প্রধান কারণ, বল করেছেন বিপুল সংখ্যক ওভার। সেটা পেরেছেন যেহেতু স্লো বোলার ছিলেন, কয়েক পা হেঁটে এসেই বল করতেন, তাই কম শক্তিব্যয় হত। ১৯৩৩-এ তিনি ২০৯৩ ওভার বল করেছিলেন। ম্যাকডোনালড ১৯২১-এর ইংল্যাণ্ড সফরে ৮৫৪ ওভার বল করে ১৫০ উইকেট পান। এই হারে যদি ২০৯৩ ওভার বল করতেন, তাহলে ওই মরশুমে তিনি ৩৫৮টি উইকেট পেতে পারতেন!

সচরাচর ফাস্ট বোলারদেরই সেরা ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ হানতে হয় এবং প্রায়শই তাঁরা ক্লান্ত থাকেন, যখন শেষেরদিকের লোকেরা ব্যাটিং ক্রীজে হাজির হয়। যে-সব বোলাররা ফেলে ছড়িয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করেনি, তাঁরা তখন অপেক্ষাকৃত শস্তা এই উইকেটগুলি কুড়িয়ে নেবার সুযোগ বেশি করে পায়।

দক্ষিণ আফরিকার বিরুদ্ধে ১৯১৩-১৪ টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের সিডনী বারনেসের ৪৯ টি উইকেট (মাত্র চারটি টেস্ট খেলে) পাওয়ার নজীরটি, মনে হয় চিরকাল থেকে যাবে। বারনেসের গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারুর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাঁর

সময়ে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। পরিসংখ্যান থেকে একটি মজার খবর পাওয়া যাচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ বোলিং গড়পরতার নমুনাগুলির মধ্যে গড় ১০ রানের কমে এক সিরিজে ত্রিশটির বেশি উইকেট পাওয়ার যে পাঁচটি নমুনা আছে, তার মধ্যে তিনটিই দক্ষিণ আফরিকার বিরুদ্ধে—বোলাররা হলেন লোমান (১৮৯৫-৯৬) বারনেস (১৯১২) ও আয়রনমঙ্গার (১৯৩১-৩২)। হয়তো ওই সময়গুলিতে দক্ষিণ আফরিকার ব্যাটিংমান ইংল্যাণ্ড, অসট্রেলিয়ার তুলনায় কিছুটা নীচুই ছিল। কিন্তু তাহলেও গড়ে ৫.৮ রানে জরজ লোমানের ৩৫টি উইকেট পাওয়া, প্রচণ্ড প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। বারনেস পান গড় ৮.২৯ রানে ৩৪, আয়রনমঙ্গার গড় ৯.৫৪ রানে ৩১। আর বাকি দুজন: লেকার গড় ৯.৬০ রানে ৪৬ অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (১৯৫৬) এবং লক গড় ৭.৪৭ রানে ৩৪, নিউজিল্যানডের বিরুদ্ধে (১৯৫৮)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বড় বোলারদের সকলেরই একই বিশেষত্ব—প্রধানত এঁরা আক্রমণাত্মক বোলার, এঁদের প্রধান লক্ষ্য স্টাম্প। বোলিংয়ের মূল উপাদানগুলির মধ্যে নিখুঁত লেংথ এবং ডিরেকশন রাখা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা স্বীকার করেও কিছুটা রাশ্ আলগা না করে উপায় নেই। আরথার মেইলি প্রচণ্ড স্পিন করাতেন বলে। লেংথ বা ডিরেকশন তার ফলে অনেক সময়েই এধার-ওধার হত। বেড-সারের মত নিখুঁত মাপে নাগাড়ে বল করবেন এটা তাঁর কাছে আশা করা যায় না অথচ মেইলি যে বড় বোলারদেরই একজন সেটাও খাঁটি কথা। প্রচণ্ড স্পিন এবং নিখুঁত লেংথ একই সঙ্গে আশা করাটা ঠিক হবে না। মেইলির থেকে বেডসারের পক্ষে লেংথ রেখে বল করাটা অনেক সহজ। তাঁর বলের দ্রুতগতিই, পা চালিয়ে ব্যাটসম্যানের পক্ষে বেরিয়ে এসে বলের লেংথ হেরফের করে দেওয়ার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

খেলার কতকগুলো দেশজ পরিবেশগত কারণে, এক দেশে

এক ধরনের বোলার তৈরী হয়। অসট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইনডিজ এবং ভারতের শক্ত উইকেটের প্রভাব সম্ভবত স্পিন বোলিংয়ের উপর অনেকটা ছড়িয়েছে। এইসব দেশে সফল স্পিনার হতে হলে তাকে কব্জি মুচড়ে স্পিন করাতে হবে। শুধুই আঙুল দিয়ে বল ঘোরাবার মত যথেষ্ট স্পিন পাওয়া সম্ভব নয়। কব্জি এবং আঙুলের সম্মিলিত প্রয়োগে আরো বেশি স্পিন করান যায় এবং লেংথ ও ডিরেকশন বিসর্জন না দিয়ে যদি তা করান যায় তাহলে শক্ত উইকেট বলকে যে বাড়তি গতি দেবে, ইংল্যাণ্ডের মত ধীরগতির পীচ তা দিতে পারে না।

উইকেট অনাবৃত রাখার জন্য, ইংল্যাণ্ড থেকে ডান হাতের অফ-স্পিনার এবং ল্যাটা (তর্জনী দিয়ে ঘোরান) স্পিনার বরাবরই উৎপন্ন হয়েছে। গত কুড়ি বছরের মধ্যে লেকার-লক, অ্যাপলইয়ারড-ওয়ারডল জুড়ি ছাড়াও অ্যালেন, টিটমাস, ইলিংওয়ারথ এবং সম্প্রতি আনডারউডকে দেখা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে বৃষ্টিক্ষত পীচে শরট-লেগ ফিলডসম্যান দ্বারা উইকেট সংগ্রহের বহু সুযোগ পায় অফ স্পিনাররা। কিন্তু ভারত বা অস্ট্রেলিয়ায় কদাচিৎ তা পাওয়া যায়। কোন থিওরীর প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটাতে গেলে সেটিকে প্রয়োগের মত সুযোগ পাওয়া চাই। ইংল্যাণ্ড বোলাররা যে সুযোগ পায় অন্য দেশের বোলাররা তা পায় না।

শ্রেষ্ঠ বোলার নির্বাচন করার জন্য যেসব বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা দরকার তার অনেকগুলিই পেশ করেছি।

ধাপে ধাপে বোলিংয়ের নানাবিধ বিকাশ আমরা দেখেছি—আনডার আরম লবের দিন থেকে আজ পর্যন্ত। সোয়ারভ এবং সুইং অফ-ব্রেক, লেগ-ব্রেক ও গুগলি এবং অস্বাভাবিক নানান রকমফেরের—সিসিল পেপার বা জ্যাক আইভারসনের মত বোলাররা যা দেখিয়ে গেছে—ইতিহাস আমরা খুঁজে বার করতে পারি। এখন ভাবি একটি হাতের পাঁচ আঙুলের দ্বারা নতুন

কোনো বোলিং পদ্ধতি মানুষের আবিষ্কার করার জন্য বাকি আছে কিনা! হয়তো আছে। তবে পুরনো সেই মৌল (লেংথ, ডিরেকশন ইত্যাদি) ব্যাপারগুলিই চিরদিন দরকার হবে।

এরপরে যখন কেউ তাঁর প্রিয় বোলারের জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তুলবেন তখন তর্কাতর্কি চালাবার জন্য কিছু উপাদান এই রচনা মারফৎ মনে হয় সরবরাহ করতে পেরেছি।

□ শ্রেষ্ঠ টেস্ট অল-রাউণ্ডার ফকনার ও সোবার্স ছাড়া আর □
কাউকে বলা যায় না

ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বাংশে অল-রাউণ্ডার ছিলেন সম্ভবত হ্যাম-শায়ারের জরজ ব্রাউন। তাঁর কাউনটির পক্ষে বল করে তিনি ছয় শতাধিক উইকেটই শুধু সংগ্রহ করেনে নি, গ্রেগরী এবং ম্যাক-ডোনালডের বলের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ইনিংস সূচনা ছাড়াও উইকেট-কিপিংও করেছেন।

অ্যালফ্রেড লিটলটনের কথাও বলা যায়। ১৮৮৪-র ওভাল টেস্টে প্রথমে উইকেটকিপার হিসাবে একটি ক্যাচ ধরেন, তারপর প্যাড ও গ্লাভস খুলে বল করে, ১২-৫-১৯-৪, এই বোলিং হিসাব নিয়ে আবার প্যাড ও গ্লাভস পরেন।

আদর্শ অল-রাউণ্ডার বলতে তাকেই বোঝায় যিনি শুধুমাত্র ব্যাটিং এর জোরে দলে স্থান পাবার যোগ্য অথবা শুধু বোলিং ক্ষমতার জন্যই (ফিল্ডিয়ে তিনি যে সুদক্ষ হবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য)। আরো কিছুটা পার্থিবস্তরে অল-রাউণ্ডার বলতে বোঝায়, তিনি এমনই বোলার যার কাছ থেকে রানের জন্য ভরসা করা যেতে পারে অথবা এমনই ব্যাটস্‌ম্যান দলের আক্রমণ বিভাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। খাঁটি টেস্ট অল-রাউণ্ডার দুষ্প্রাপ্য। ১৯০৬-এ ২,৩৮৫ রান ও ২০৮ উইকেট সংগ্রহ করা সত্ত্বেও জরজ হাস্ট ইয়রকশায়ারের পক্ষে যত বড় খেলোয়াড় ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ততটা হতে পারেন নি।

এ পর্যন্ত যে ১০৮ জন ইংল্যাণ্ডের মাঠে এক মরশুমে 'ডাবল'

(হাজার রান ও একশো উইকেট) করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনই এই শতাব্দীতে টেস্ট অল-রাউনডার হিসাবে সফল হয়েছেন ঃ ইংল্যাণ্ডের বেইলি এবং উলী ; অস্ট্রেলিয়ার আরমস্ট্রং এবং গ্রেগরী ; দক্ষিণ আফরিকার ফকনার ভারতের মাঁকড় এবং —যখন মেজাজে থাকেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কনসটানটাইন। এঁরা এবং এঁদের সঙ্গে বেনো, ডেভিডসন, মিলার, নোবল, গডার্ড (দঃ আফরিকা) এবং সোবার্স শ্রেষ্ঠ টেস্ট অল-রাউণ্ডার খেতাবের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম।

রোডস এবং হ্যামনডকে অন্তর্ভুক্ত করিনি, উলী ও বাদ পড়বেন ; তিনজনকে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব নয়। যে অর্থে সোবার্সকে টেস্ট অল-রাউণ্ডার বোঝায় বা বেইলিকে বোঝাত, ওঁদের ঠিক সেই অর্থে তা বলা যায় না। রোডস আরম্ভ করেন বোলার হিসাবে। প্রথম তিনটি সিরিজে উইকেট পান ৬৬ কিন্তু রান করেন মাত্র ২১১। এরপর তিনি প্রধানত ব্যাটসম্যানই হয়ে যান, বল করতেন কদাচিৎ। হ্যামনডের ক্ষেত্রেও এই রকম। যে ১৯টি টেস্ট সিরিজে তিনি খেলেছেন তার মধ্যে অল্প-সল্প বল করেছেন মাত্র আটটিতে। উলী ১৪টি সিরিজে খেলে বল করেছেন ছয়টিতে। অথচ উলী ও রোডসের 'ডাবল' লাভের সংখ্যা ৮ ও ১৬ এবং হ্যামনডের বোলিং যখন কার্যকারিতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন 'প্লাম' ওয়ারনারকে তিনি সিড বারনেসের কথা মনে পড়াতেন।

শুধুমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগের ক্রিকেটারদের মধ্যে তুলনা এখন অসম্ভব। রান সংগ্রহের ভঙ্গি বিভিন্ন যুগে বদলেছে সুতরাং এ ধরনের তুলনা চলে না। যেমন ১৮৮০-র দশক এবং ১৮৯০-এর দশকে যা রান উঠেছিল তার থেকে ১৯০০-১৪ এই বছরগুলিতে সংগৃহীত রান প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশি, দুই মহাযুদ্ধের মাঝের বছরগুলিতে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি এবং ১৯৫০-৬৯ বছরগুলিতেও আবার প্রায় অর্ধেক বেশি। সুতরাং বোধ

হয় অন্যায্য হবে না যদি বলা যায় জর্জ গিফেনের (১৮৮১-৯৬) যৎসামান্য ২৩.৩৫ টেস্ট ব্যাটিং গড় দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের ৪৩ গড়ের তুল্য এবং রঞ্জির (১৮৯৬-১৯০২) ৪৪.৯৫ টেস্ট গড় ৮০ গড়ের তুল্য। পিচ এক দশক থেকে আর এক দশকে বদলে যায়, সুতরাং এর ফলে কিছু কিছু বোলার ইংল্যাণ্ডের উইকেট থেকে কিভাবে সাহায্য পেয়েছেন বা পাননি সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। অস্ট্রেলিয়ার মণ্টি নোবল যেমন তাঁর অর্ধেক উইকেট সংগ্রহ করেছেন ইংল্যাণ্ডের পিচে তেমনি অনেকের ক্ষেত্রে এই হার অন্যরকম হয়েছে। যেমন ফকনারের হার এক-তৃতীয়াংশ সোবার্সের এক চতুর্থাংশ, বেনোর এক-পঞ্চমাংশ, ম'াকড়ের এক-সপ্তমাংশ।

নিজ আমলের পরিপ্রেক্ষিতেই ক্রিকেটারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তখন যেসব অবস্থা বর্তমান থাকে তার উপরেই তাঁদের সাফল্য বা অসাফল্য নির্মিত হয়। যাট-সত্তর বছর আগে যে অফ-স্পিনার তিনদিনের টেস্ট খেলতেন তিনি এখনকার পাঁচদিনের টেস্ট খেলায় কী একই সাফল্য লাভ করতেন? কাজেই, বিভিন্ন আমলের ক্রিকেটারদের মধ্যে তুলনা করার জন্য যদি উপায় খুঁজতে হয় তাহলে যে দলের হয়ে তাঁরা খেলেছেন সেই দলের প্রতি তাঁদের অবদান কতটা, সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত উপায় বলে মনে হয়। সেইভাবে কয়েকজন বিরাট স্পেশালিস্টের রান এবং উইকেট সংগ্রহের হার নিচে দিলাম :

			দলের শতকরা	
ব্যাটিং গড়		বোলিং গড়	রান	উইঃ
৯৯	ব্র্যাডম্যান	—	২৬	—
৬১	হেডলি	—	২৬	—
৫৮	হ্যামনড	—	১৮	—
৫৭	হবস	—	:৮	—
—	বারনেস	১৬	—	৩৯

			দলের শতকরা	
ব্যাটিং গড়		বোলিং গড়	রান	উইঃ
—	ওরিলী	২৩	—	৩৩
—	ট্রুম্যান	২২	—	২৯
—	গুপ্তে	৩০	—	২৯

এবার স্থির করা দরকার শক্তিশালী দলের পক্ষে খেললে একজন খেলোয়াড় কতটা সুবিধা পায়। যেসব অল-রাউণ্ডারদের নাম উপরে করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চারজন—মাঁকড়, ফকনার, গডার্ড এবং কনসটানটাইন—যে দলে খেলেছেন, সেই দল যত না জিতেছে তার থেকে বেশি হেরেছে। অথচ অনেকেই—আরমস্ট্রং গ্রেগরী, নোবল, মিলার, বেনো এবং বেইলি—যে দলের হয়ে খেলেছেন হারের থেকে জিতের সংখ্যাই তাঁদের বেশি।

কিন্তু আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে, ওরেল, উইকস ও ওয়ালকটের পর ব্যাট করতে নামায় বা লিনডওয়াল মিলার ও জনস্টনের পর বল করায় যদি সুবিধালাভ ঘটে তাহলে অসুবিধাও আছে। ওঁদের পর উচ্চহারে রান তোলা বা উইকেট পাওয়া সমভাবেই কঠিন। এর উল্টোটিও মনে রাখা দরকার। দুর্বল দলের পক্ষে ব্যাট করলে উচ্চহারে রানতোলার সম্ভাবনা থাকে বটে (হিন্দু দলের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে অবশিষ্ট দলের মোট ৩৮৭ রানের মধ্যে একাই ৩০৯ রান করেন অর্থাৎ শতকরা ৭৯ ভাগ) কিন্তু তাকে আরো বেশি ঝুঁকি নিতে হয় তৎপর তাজা বোলারদের বিরুদ্ধে।

তিন বা পাঁচ, যতদিনেরই টেস্ট খেলা হোক, বোলারকে বিচার করতে হবে তাঁর আঘাত হানার ক্ষমতা থেকে অর্থাৎ বলপিছু উইকেট সংগ্রহের হার থেকে। তাতে দেখা যায় প্রতি উই-কেটলাভের জন্য নিম্নোক্তরা বল করেছেন: ফকনার ৫১, নোবল ৫৮, কনসটানটাইন ৬১, ডেভিডসন ৬২, মিলার ৬২, গ্রেগরী ৬৫,

বেইলি ৭৪, বোনো ৭৬, সোবার্স ৯০, মাঁকড় ৯১, আরমস্ট্রং ৯২, গডার্ড ৯৫।

তর্কের খাতিরে কেউ যদি বলেন, ফকনার ও সোবার্স দুই আমলে বল করেছেন তাই ওদের মধ্যে ব্যবধানটা বেশি তাহলে বলতে হয়, ডেভিডসন, মিলার ও সোবার্স কমবেশি একই সময়ের। তেমনি বেনো এবং গডার্ডও। গণিতের যুক্তি থেকে কিছুটা সরে এসে বলা যায়, অল-রাউণ্ডারদের ক্রমপর্যায় নির্ধারিত হয়ে আসছে, রান ও উইকেট সংগ্রহের শতকরা হার সংযোজন দ্বারা।

তাহলেই দেখা যাবে বেনো এবং ডেভিডসন,—যাঁরা প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যাটিং দলের পক্ষে খেলেননি, দুজনেই মূলত খুবই বড় বোলার এবং ঘোরালো অবস্থায় মোটামুটি ভাল ব্যাট করতে পারেন। সফরকালে যদি ওঁদের বল করার হাতে আঘাত থাকে তাহলে শুধুই ব্যাটিং-এর জন্য দলে স্থান পাবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। আরমস্ট্রং নিঃসন্দেহে বড় ক্রিকেটার কিন্তু তাঁর উইকেট পিছু বলের সংখ্যাটা ৯২ হওয়ার কারণ বোধ হয়, অত্যাধিক স্লো লেগ-থিওরির আশ্রয় নেওয়া। এজন্যই তাঁকে, শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার নির্বাচনে গণ্য করা যায় না। এইজন্য মাঁকড় এবং গডার্ডও বাদ পড়ছেন। টেস্ট খেলায় কনস্টানটাইন আপন প্রতিভাকে পূর্ণভাবে খুব সামান্যই উপলব্ধি করেছেন।

বাকি রইলেন ফকনার, গ্রেগরী, মিলার, বেইলি, নোবল ও সোবার্স, ব্যাটে বা বলে ব্যর্থ হলেও এঁরা প্রত্যেকেই অনবদ্য ফিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন। এবার যদি আমরা শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডারের কাছ থেকে দ্রুত হারে রান তোলার প্রত্যাশা জানাই তাহলে বেইলি এবং সম্ভবত নোবলকে বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া শুধুই অফের দিক থেকে নোবলের বল আসে, এটাও তাকে বাদ দেওয়ার কারণ হতে পারে। গ্রেগরী এবং মিলার অবশ্যই দ্রুত হারে রান তুলতে পারেন এবং দুজনেই চিরশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলারদের

পর্যায়ভুক্ত কিন্তু উভয়েই আউট হতে বাধ্য হন মনসংযোগ না করার জন্য।

ফকনার এবং সোবার্স—তুজনেই বিরাট স্ট্রোক-প্লেয়ার এবং ফিল্ডসম্যান। প্রথমজন ছিলেন লেগ-স্পিনার; অন্যজন করেন বোলিংয়ের যাবতীয়। ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯০৯-১০ ও ১৯১০-১১ সিরিজে ফকনার ৬৭ গড় রেখে ১,২৭৭ রান করেন হার্স্ট, হেই, ব্লাইথ, কটার, হুইট, হরডারন এবং আরমস্ট্রং প্রমুখের বলে। পরবর্তী ব্যাটসম্যানের গড় ছিল তিরিশেরও কম। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে পাঁচটি সিরিজে সোবার্স ৮৩ গড় রেখে ২,৯২২ রান করেন ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, ডেভিডসন, বেনো, গুপ্তে এবং অন্যান্যদের বলে।

উপরোক্ত তুটি সিরিজে ফকনার দলীয় রানের শতকরা ২৪ ভাগ নিজে করেন এবং শতকরা ২২ ভাগ উইকেট নেন। টেস্টে তিনি উইকেট পেয়েছেন, হবস, হেওয়ারড, জনি টাইলডসিল, ফসটার, ফ্রাই, উলী, স্পুনার, ট্রামপার, বারডসলি, র‍্যানসফোরড এবং আমস্ট্রংয়ের। আর সোবার্স অবশ্য তাঁর সময়ের প্রায় সকলকেই আউট করেছেন। সন্দেহ নেই শ্রেষ্ঠ টেস্ট অলরাউণ্ডার এই তুজনই—অব্রে ফকনার ও গ্যারি সোবারস।

টেস্ট অল-রাউণ্ডার

১৯০০-১৯৭০

ব্যাটিং গড়	বোলিং গড়	দলের শতকরা রান	দলের শতকরা উইঃ	মোট
৪১ ফকনার (১৯০৫-২৪)	২৭	১৭	২২	৩৯
৩১ মাঁকড় (১৯৪৬-৫৮)	৩২	১১	২৮	৩৯
৬০ সোবার্স (১৯৫৩-৭০)	৩৩	১৭	১৭	৩৪
৩৭ গ্রেগরী (১৯২০-২৮)	৩১	১০	২৩	৩৩
২৫ ডেভিডসন (১৯৫৩-৬৩)	২১	৮	২৫	৩৩
২৪ বেনো (১৯৫৩-৬৪)	২৭	৮	২৫	৩৩
৩৭ মিলার (১৯৪৬-৫৬)	২৩	১১	২০	৩১
৩৪ গডার্ড (১৯৫৫-৭০)	২৬	১৩	১৮	৩১
৩০ নোবল (১৮৯৭-১৯০৯)	২৫	১১	১৮	২৯
২৯ বেইলি (১৯৪৯-৫৯)	২৯	১০	১৬	২৬
৩৮ আরমস্ট্রং (১৯০১-২১)	৩৪	১২	১৩	২৫
১৯ কনস্টানটাইন (১৯২৮-৩৯)	৩০	৮	১৭	২৫

□ টেস্ট ক্রিকেট যুদ্ধ □

১৯৩২-৩৩-এ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মরশুমে যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে, 'বডিলাইন সিরিজ' নামে তা ক্রিকেট ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন তাঁর তিনজন ফাস্ট বোলার—লারউড, ভোস ও বাওয়েসকে (চতুর্থ ফাস্ট বোলার 'গাবি' অ্যালেন সহযোগিতা করেন নি) দিয়ে যে আক্রমণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাতে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানরা বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। লেগস্টাম্প লক্ষ্য করে দ্রুত সর্টপিচ বল, (অস্ট্রেলীয় মতে শরীর লক্ষ্য করে)—এই ছিল পদ্ধতি। এই ধরনের বল ব্যাটসম্যানরা হুক করেন (ম্যাকার্টনীর মতে, পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া উচিত ছিল), কিন্তু লারউডের বল এত দ্রুত এবং নিখুঁত লক্ষ্যে আসতে থাকে যে বলের গতিপথ থেকে সরে গিয়ে, সেই বল মারার মত হিম্মৎ বা দক্ষতা দেখাতে অধিকাংশ অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানই ব্যর্থ হন (অবশ্য প্রথম টেস্টে ম্যাককেবের ১৮৭ সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর সংগ্রামের গৌরব দাবী করতে পারে।) স্বদেশী ব্যাটস-ম্যানদের হেনস্থা দেখে অস্ট্রেলীয়রা ক্ষেপে যান। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড এম সি সি-কে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠায়। অস্ট্রেলিয়াস্থ ইংরেজ হাই-কমিশনারের অনিদ্রারোগ দেখা দেয়। ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় কমনওয়েলথ সম্পর্ক থাকবে কি থাকবেনা, তাই নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ভাবনা শুরু হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এমন উত্তেজনা দেখা দেয় যেন বিদেশী বাহিনী দ্বারা দেশ আক্রান্ত। সেই সময় মেলবোর্নের "ট্রুথ" নামে এক সাপ্তাহিকে অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টের পর

একটি রচনা প্রকাশিত হয়, যার হেডিং ছিল, "ইংল্যাণ্ড আশা করে তার খেলোয়াড়রা বল দ্বারা বা মারের দ্বারা বিপক্ষকে আউট করবে। এরপর—অস্ত্র নিয়ে ক্রিকেট ?"

অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলীয় উইকেটকীপার বার্ট ওল্ডফিল্ডের মাথা ফাটে লারউডের বলে। জার্ডিন সহানুভূতি জানিয়ে নিউসাউথ ওয়েলসে ওল্ডফিল্ডের স্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বিল উডফুলের বুকে বল লাগে, তৎসত্ত্বেও 'বডিলাইন' পদ্ধতি তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। এই সব ঘটনার উল্লেখ করে 'ট্রুথের' রচনায় বলা হয়, "হয়তো শীঘ্রই আমরা নিম্নোক্ত ভঙ্গিতে লেখা ক্রিকেট খেলার বিবরণ এবার থেকে পড়ব।"

আসন্ন চতুর্থ টেস্টের একটি কাল্পনিক বিবরণ সেই রচনায় প্রকাশিত হয়। তার অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি ঃ "অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলায় তুমুল লড়াই হয়ে গেল। ছয়জন লোককে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়। তার মধ্যে তিনজন সরাসরি মারা যান। অন্যান্যরা লড়াইয়ের শুরুতেই আহত হন। ইংল্যাণ্ড পক্ষে আটজন নিহত ও তিনজন নিখোঁজ। অস্টেলিয়ার অব্যর্থ সন্ধানী কাঁদানে গ্যাস, বিষাক্ত বাষ্পের গোলা বা টিনের কৌটোর বোমা এড়িয়ে এরা কিভাবে যে নিখোঁজ হল তার কারণ এখনো অনাবিষ্কৃত। তবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় বোর্ড অফ কনট্রোল এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

"স্যার জর্জ পিয়ার্সকে যখন প্রশ্ন করা হয়, অনুসন্ধান থেকে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে তখন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি বলেন, "কিছুই না।" তাঁর মতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিচালিত হয়।

"পরবর্তী সংবাদে সুনির্দিষ্টভাবেই জানা যায়, নিখোঁজ ইংরাজরা ডারউইনে অবস্থান করছে। তারা সেখানে লুকিয়ে আছে। মনে হয় পরের বিমানেই দেশে চম্পট দেবে।

তারা খালি পেট্রল ড্রামের ছদ্মবেশ ধরবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

"এইরকম বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে যদি এরপর থেকে ক্রিকেট খেলা হয় তাহলে আশা করা যায়, যে-উত্তেজনা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল তার কিছু কিছু আবার ফিরে আসবে।

"ট্যাঙ্কের মধ্য থেকে উডফুল এবং ফিঙ্গলটন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ওপেন করবেন। স্টেডিয়ামের দর্শকাসনের পিছনে সামরিক সুবিধাজনক কোন স্থানে রক্ষিত ১৮ পাউণ্ডের কামান থেকে লারউড গোলা ছুঁড়তে শুরু করবেন। জার্ডিন দুটি কলম ও দু' ডজন টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন শোকবার্তা পাঠাতে। আর্কডেল পার্কহিল (ডাক বিভাগের কর্তা) সেগুলি সস্তায় পাঠাবার সুযোগ তাঁকে দেবেন। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রেরিত এই ধরণের সংবাদ পাঠে পাঠকরা রোমাঞ্চিত হবেন :

"লারউডের প্রথম গোলাটা খুবই নিরীহ ধরনের ছিল। উড-ফুলের ট্যাঙ্কের ঠিক উপরেই সেটি এসে পড়ে। ফলে ট্যাঙ্কের আকৃতিটি এমন হয়ে গেল যেন বিনা বেকিংপাউডারে তৈরী চোপসান একটি প্যান কেক। প্রথম আঘাতের সাফল্যে, জার্ডিন এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে অধিনায়ক হিসাবে কর্তব্যকর্মে আরএকটু হলেই অবহেলা করে ফেলছিলেন, যাই হোক এই সহানুভূতি বার্তাটি তিনি শেষ পর্যন্ত পাঠান—উডফুলের একটি হাত এখনো অক্ষত। একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্ভবত অটুটই থাকবে। লারউড এবং আমি দুঃখিত।

"জার্ডিনের সংবাদ-বাহক "প্লাম" ওয়ার্ণার (ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার) জানতে চান অধিনায়ক এবং লারউডের এই দুঃখ উডফুল গুরুতর জখম না হওয়ার জন্যই কিনা। জার্ডিন এই অজুহাতে উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন যে, চুক্তি অনুযায়ী মন্তব্য প্রকাশে তাঁর বাধা আছে।

"এরপর বিদায় হলেন ফিঙ্গলটন। গাবি অ্যালেন তার ট্যাঙ্কে আক্রমণ চালাচ্ছে না কেন, তাই দেখতে তিনি সামান্য একটু মাথা বার করেছিলেন, লেসলী এমস প্রজাপতি ধরার জাল দিয়ে টুক করে তাকে ধরে ফেলেন। জার্ডিন অ্যাসোসিয়েটেড নিউজ পেপারসকে (ফিঙ্গলটন এদের সাংবাদিক) টেলিগ্রাফ করলেন ঃ "বেচারা ফিঙ্গলটন, আপনারা ওকে হারালেন।"

স্যার হিউ ডেনিসন জবাব পাঠালেন ঃ "ও কিছু না—গত কয়েক বছরে এর থেকেও বেশি হারিয়েছি।"

এদিকে খেলা চলেছে। অধিনায়কের সঙ্গে পরামর্শ করে লারউড তার কামানের পাল্লা পরিবর্তন করলেন। কারণ ম্যাককেব ও রিচার্ডসন এখন খেলছেন। একটা গোলা উঁচু হয়ে এসে দর্শকদের মধ্যে ফেটে পড়ল।

আর্কডেল পার্কহিল জার্ডিনকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, আলাদা টেলিগ্রাফ লাইন এবং অতিরিক্ত টেলিগ্রাফ কর্মী নিযুক্ত করবেন কি না! 'নিশ্চয়' জার্ডিন জবাব পাঠান। পরে তিনি তিনজন স্টেনোগ্রাফার ও দুজন শর্টহ্যাণ্ড রাইটার চেয়ে পাঠান।

"খেলা আধঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে। ইংরেজ ম্যানেজাররা (ওয়ার্ণার ও প্যালাইরেট) দাবী করেন দর্শকদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা এত বেশী যে, তাদের অপসারণ করে পয়সা দিয়ে দেখতে আসা লোকেদের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। তবে এই নবাগতরা মূক-বধির আস্তানার লোক হওয়া চাই, যাতে কার্যরত জার্ডিনকে বিরক্ত হতে না হয়।

"অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হল—তিনজন হত, পাঁচজন মারাত্মক জখম, দুজন বিকলাঙ্গ। আয়রনমঙ্গার শেষ পর্যন্ত মাঠে নামতে পারেন নি। কারণ তাঁর রোমান বর্ম ও বিষাক্ত বল্লম কোথায় যে রেখেছেন তা আর খুঁজে পাননি।

"ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শুরু করতে দেরী হতে থাকে। কে ওপেন করবে তাই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সাটক্লিফ ঘোষণা করেন, যে কোন লোকের সঙ্গেই তিনি লড়তে রাজি। অবশেষে লারউডকে প্রথম মাঠে নামার জন্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু গোলমাল দেখা দিল যখন সে জানাল, বুট জোড়া তার পায়ে লাগছে।

জেমস হোয়াইটল, ইংল্যাণ্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যানকে তার করে জানালেন, তাদের আজীবন পেনসনের ব্যবস্থা করা হবে। তখন ইংল্যাণ্ডের ওপেনারদ্বয় হোয়াইটলকে অনুরোধ জানায়, বরং যথাযোগ্য বাণী সংবলিত দুটি কফিনের যেন ব্যবস্থা করা হয়। এর উত্তরে হোয়াইটল বলেন, "অবশ্যই করা হবে। উপরন্ত আপনাদের স্ত্রীরা দু' বছর যাতে নিখরচায় কাপড়কাচা সাবান পান সে ব্যবস্থাও করব।"

আর্থার মেইলি টেলিগ্রাফ করলেন, "ইংল্যাণ্ডের ইনিংস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান যায় নি, এই কথাটা বালির বস্তার আড়ালে লুক্কায়িত দর্শকদের জানাতে এক আম্পায়ার মাঠে নেমেছিলেন। মণ্টি নোবল তারবার্তা পাঠালেন, সন্ধ্যার পর মাঠ থেকে আম্পায়ারটির দেহ অপসারণ করা হবে। ট্রেঞ্চ মর্টার চালনারত এক অস্ট্রেলীয় বোলার আম্পায়ারকে কোন ইংরাজ ভেবে ভুল করে।

"জার্ডিনকে ইংল্যাণ্ডের তরফ থেকে ওপেন করার অনুরোধ জানান হয়। তিনি বলেন, "অসম্ভব, আমাকে এখন টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।" পরে জানা যায় টেলিগ্রামের মাধ্যমে তিনি দাবা খেলছেন এমন এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে যিনি ইংল্যাণ্ডে রয়েছেন। খেলা তিন মাস ধরে চলবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাকে বলা হল, যে রেটে তিনি রান করেন, তার থেকে একটু দ্রুত করলে এই সময়ের মধ্যে তিনি হয়তো ছয় রান করে ফেলতে পারেন। তবুও জার্ডিনকে প্রলুব্ধ করা গেলনা।

"অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলেই লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হল। অস্ট্রেলীয় বোলার ওয়ালকে তিনটি মেশিনগান ও বগলে লুক্কায়িত দুটি রিভলভার নিয়ে প্র্যাকটিশ করতে দেখে ইংল্যাণ্ড আর খেলতেই পারল না।

"নির্বাচকরা তারপর মিলিত হয়ে পঞ্চম টেস্টের জন্য অস্ট্রেলীয় দলের নাম ঘোষণা করেন। অ্যামরস পামার, জ্যাক ক্যাবল্, টম লুরিচ, হিউই মার্টিন দলে স্থান পেয়েছেন (এরা সকলেই খুনের আসামী)। লুইসকে দলে নেবার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পর তাকে বাদ দেওয়াই সাব্যস্ত হয়। কারণ 'লেগ থিওরী' পদ্ধতিতে প্রলুব্ধ হয়ে হয়তো সে ফাঁসি দ্বারা খুনের পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারে।

"জার্ডিনের বিশেষ অনুরোধে ব্যারাকিং ব্যবস্থা কিলারনির উপর ন্যস্ত হয়।

"বোর্ড অফ কন্ট্রোলেরও একটি সভা হয়। তাতে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের কাছে জরুরী অনুরোধ করে বলা হয় ব্যাটসম্যান কর্তৃক ব্যবহৃত রোমান ঢালের (শীল্ড) ব্যাসার্ধ, তিন ইঞ্চি কমাতে হবে। শীল্ড বিফোর উইকেটের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্যই এই অনুরোধ।

"সভায় এই সিদ্ধান্তও গৃহাত হয় যে এবার থেকে টেস্ট খেলা অপ্রকাশ্য লড়াই হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ লোককে দেখতে দেওয়া হবে না। তাহলে লারউডকে কেউ গালিগালাজ বা জার্ডিনকে নিন্দামন্দ করতে পারবে না। ইংল্যাণ্ড দলকে নিজেদের খরচেই অস্ট্রেলিয়া সফর করতে হবে। এইভাবে হিংস্র জনতাকে দূরে সরিয়ে রেখে শান্ত নীরবতার মধ্যে,—যা শুধুমাত্র ভঙ্গ হবে হাড়ভাঙার মট মট শব্দে—টেস্ট খেলার ব্যবস্থা সভায় গৃহীত হয়।"

□ আষাঢ়ে টেস্ট রীলে □

গল্প বললে গল্প, কিন্তু সত্যি গল্প। ১৯৩৮-এর ব্যাপার। ইংল্যাণ্ডে তখন টেস্ট খেলা চলছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। খেলার বিবরণ অস্ট্রেলিয়ায় রিলে করা হয়।

পার্থ-এর বিখ্যাত এসপ্ল্যানেড হোটেলের মালিক রয় প্যাক্সটন ঠিক করল ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম দিনের খেলা তার হোটেল লাউঞ্জেই রিলে করা হবে লাউডস্পীকার মারফৎ। স্রেফ পাটোয়ারী বুদ্ধির কাণ্ড। রিলে শুনতে খদ্দেরের ভীড় হবে। তারা তো শুকনো গলায় খালি পেটে বসে থাকবে না, খেতে হবেই। এইসব ভেবে প্যাক্সটন প্রচুর খাবার তৈরী করল, এক রাত্রের জন্য মদ্যপানের বিশেষ লাইসেন্সও আদায় করে আনল।

ইংল্যাণ্ডে যখন খেলা শুরু অস্ট্রেলিয়ার তখন সন্ধ্যা কাবার। রিলে শ্রোতারা তো ডিনার সেরে লাউঞ্জে এসে পার্থের বিখ্যাত এমু এবং সোয়ান বীয়ার পান করছেন। প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত থাকতে হবে।

রিলে শুরুর কিছু আগে প্যাক্সটন তার নিজের ঘরে বসে রেডিও মারফৎ শুনল ম্যাঞ্চেস্টারে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিনকার মত খেলা বন্ধ। প্যাক্সটনের মাথায় হাত। এবার তো খদ্দেররা চলে যাবে। তাহলে এত টাকা খরচ করে, এই যে এলাহি ব্যবস্থা হল তার কি হবে! তবু রক্ষে খবরটা লাউঞ্জের অপেক্ষমান শ্রোতারা এখনো জানতে পারেনি, কারণ সেখানে কোন রেডিও সেট নেই।

তখন মাথায় বুদ্ধি খেলল প্যাক্সটনের। এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে তখুনি ঠিক করল, কল্পিত খেলা রিলে করে তারা লাউঞ্জের

লোকেদের শোনাবে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে দুজনে আষাঢ়ে রিলে ফাঁদতে বসে গেল।

ককটেলবারের পিছনে একটা ঢাকা জায়গায় মাইক্রোফোন নিয়ে দুজন বসল। প্যাক্সটনের বন্ধু প্রথমে শুরু করল বি বি সি-র ওভারসীজ নিউজ সার্ভিসের শেষ দু-এক মিনিট দিয়ে। তারপরই প্যাক্সটন ঘোষণা করল, এবার শ্রোতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টারে। ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ এইবার আরম্ভ হবে।

উত্তম ভোজ্য ও উপাদেয় পানীয়ে পরিতৃপ্ত লাউঞ্জ নড়েচড়ে বসল। প্যাক্সটনের বন্ধু মুখে একটুকরা জলপাই রেখে শুরু করল রিলে। আর প্যাক্সটন লাউঞ্জে পায়চারী করতে থাকল ভাবগতিক বোঝার জন্য।

"ওয়েল অস্ট্রেলিয়া, হেয়ার উই আর অ্যাট ওল্ড ট্রাফোর্ড"—শুরু হল রিলে, আধঘণ্টা আগে ইংল্যাণ্ড দলের এগারো জনের নাম ঘোষিত হয়েছে। এসেক্সের ফাস্ট বোলার নিকলস দলে স্থান পেয়েছেন। আপনারা সকলেই জানেন প্রথম দুটি টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। আপনাদের অসীমসাহসী ছোট্ট অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান ও হ্যামণ্ডের মধ্যে টস হওয়ামাত্রই ফলাফল যাতে আমাদের কাছে রিলেবক্সে পৌঁছয় তার আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা একথা শুনে নিশ্চয় অবাক হবেন না, কালরাত্রে এখানে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। তবে উইকেট এখন শুকিয়ে গেছে। আম্পায়াররা খেলার উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। দুই অধিনায়ক যে কোন মূহূর্তেই টস করার জন্য বেরোবেন। এর উপর খেলার অনেক কিছুই নির্ভর করছে। ওই যে তাঁরা মাঠে নেমেছেন, অ্যাঁ, কি বললে আর্থার? ও হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ওরা টস করবেন। ব্র্যাডম্যানের মুখে রহস্যময় হাসি, হ্যামণ্ড যথারীতি নিরুৎসুক। ওয়ালী কখনো দেখানেপনায় অভ্যস্ত নয়।"

প্যাক্সটন লাউঞ্জে বসে প্রত্যেকের হাবভাব লক্ষ্য করে চলেছে। কেউই জানে না যে আসল খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ। এখন সে খবর এদের জানার সম্ভাবনাও কম। ওর ঠিক পাশেই বসেছেন স্যার টমাস কুম্ব। এই বৃদ্ধ ক্রিকেটের নামে পাগল। খেলায় কি হতে পারে বা না পারে সেই সম্ভাবনার আলোচনায় তিনি ব্যস্ত পাশের আর এক ক্রিকেট পাগলের সঙ্গে।

"বুঝলে বিল, এই টসই সব কিছু। এই পীচে যদি আমাদের ব্যাট করতে হয়, তাহলে লাঞ্চের আগেই আমরা আউট হয়ে যাব। জানই তো আমাদের বাবুদের কেরামতিটা।"

"তা আর বলতে, ওয়েটারটা গেল কোথা ? ওহে ছুটো হেনেসি, জলদি।"

তখন রিলেতে বলছে—"ব্র্যাডম্যান টসে জিতেছেন। এখন তিনি ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা সেটাই দেখার।"

"ইডিয়ট কোথাকার, এতে আর দেখাদেখির কি। ইংল্যাণ্ডকে আগে ব্যাট করতে পাঠাও।" স্যার টমাস গর্জন করে উঠলেন।

"ব্র্যাডম্যান ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইংল্যাণ্ড ফিল্ড করতে মাঠে নামছে।" শোনা গেল রিলে থেকে।

এই সময় স্যার টমাস কুম্ব, তাঁর নাইটত্ব অভিজাত্য এবং চেয়ারের হাতলে রাখা পানপাত্রের কথা ভুলে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। মেঝেয় ছিটকে পড়ল ভরা পানপাত্র। "হতচ্ছাড়া গাড়োল। ওটা ভেবেছ কি ? অসীমসাহসী ছোট্ট অধিনায়কের নিকুচি করেছে।"

ব্যাপার দেখে প্যাক্সটন তাড়াতাড়ি ককটেল বারের পিছনে এসে বন্ধুর হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে বলতে লাগল, "প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্র্যাডম্যান হয়তো বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছেন। এই উইকেট প্রথমে ব্যাটসম্যানেরই সহায়ক হবে। রোদ যত চড়বে উইকেট ততই খারাপ হবে। ফিল্ডাররা যে যাঁর জায়গায়

দাঁড়িয়েছেন। নিকলস বোলিং শুরু করবেন। তিনি দৌড় শুরু করেছেন। না, থেমে পড়লেন। ফার্স্ট স্লিপ অধিনায়ক হ্যামণ্ডের কাছে গিয়ে কি যেন বলছেন। ঠিক বলতে পারব না কি কথা ওঁদের মধ্যে হচ্ছে। ওঃ হ্যাঁ, ধন্যবাদ চার্লস, কাঠগুঁড়ো চাইছেন নিকলস।"

এরপরই রিলেকারী ঘোষণা করলেন, "এখন আমরা স্টুডিওয় ফিরে যাব। প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। আমরা স্টুডিওয় ফিরে যাচ্ছি।"

তারপরই।

"বি বি সি-র লণ্ডন স্টুডিও থেকে বলছি। গ্রেট বৃটেনের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এখন আপনাদের কিছু বলবেন।"

তারপরই।

"সুপ্রভাত শ্রোতৃবৃন্দ। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনি ফরাসী উপনিবেশগুলি জার্মানী ও ইতালির হাতে সমর্পণ করার জন্য আবার দাবী জানিয়েছেন। আমি এবং আমার মন্ত্রী পরিষদ হোয়াইট হল থেকে পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখছি। আশা করব এই সঙ্কটকালে আপনারা ধৈর্যের পরিচয় দেবেন।"

"চুলোয় যাক উপনিবেশ", আবার স্যার টমাসের গর্জন শোনা গেল, "ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ফিরে যাও।"

"এখন আমরা আবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরে এসেছি। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর এখন শূন্যের বিনিময়ে দুই।"

"যাক এখনো কেউ আউট হয়নি।" স্যার টমাস হাঁফ ছাড়লেন।

"ইংল্যাণ্ডে স্কোর পড়া হয় উল্টো করে। আসলে ওটা হল দুই-এর বিনিময়ে শূন্য রাণ।" বন্ধুটি সায় দিয়ে যোগ করলেন।

"অস্ট্রেলিয়ার যে দুজন আউট হয়েছেন", রিলেতে শোনা গেল, "তারা হলেন ফিঙ্গলটন কট হ্যামণ্ড বোল্ড নিকলস ০, এবং হ্যাসেট

বোল্ড নিকলস ০। ব্রাউন কোন রান না করে এখনো অপরাজিত। স্ট্যান ম্যাককেব খেলতে নামছেন। এক মাস আগেই ট্রেন্টব্রিজ টেস্টে ইনি চমকপ্রদ ডবল সেঞ্চুরী করেন। আজ নাটকীয়ভাবে খেলা শুরু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"ছয়ের বদলে শূন্য! কি বলেছিলুম? এই ব্র্যাডম্যানটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে এই পীচে আগে ব্যাট করে?" স্যার টমাসের কণ্ঠে কান্নার আভাষ।

"নিকলস আসছেন, প্রথম ওভারের শেষ বলটি করতে। ম্যাককেব খেলেছেন, আউট আউট। না, না, হয়নি, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। শূন্য রানে অস্ট্রেলিয়ার তিনটি উইকেট পড়ত, যদি বলটি এক চুল বাঁ দিক দিয়ে যেত। বলটি সামান্য শর্টপিচ ছিল। মাককেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সেটি মিড অনের দিকে মারতে গিয়ে ফস্কে যান। লেসলি এমস বলটি কুড়িয়ে নিলেন। তিনি হাসলেন, ম্যাককেবও তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।"

"স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি! শূন্য রানে দুটো উইকেট পড়ে গেছে, তখন এই খেলা?" স্যার টমাসের গলা লাউঞ্জে ফেটে পড়ল। সমবেত শ্রোতারা সায় দিয়ে দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"ওহ্ চমৎকার মার, ব্রাউন লেগ গ্লান্স করেছেন। ফার্নেসের বল। তিন রান নিলেন। মাঠ মন্থর হওয়ায় বলটির গতি কমে গেল তাই বাউণ্ডারী হল না। অস্ট্রেলিয়ার দুই উইকেটে তিন। ফার্নেস বল করছেন ম্যাককেবকে। ড্রাইভ করেছেন কভারে। বিদ্যুৎগতিতে বল ছুটে গেল বাউণ্ডারীতে। চার রান।"

প্রসঙ্গত একটা কথা জানিয়ে রাখছি, মাঠের দর্শকদের করতালিধ্বনি শোনাবার জন্য একটা বড় ঠোঙার কিছু চালভরে মাইক্রোফোনের কাছে জোরে জোরে ঝাঁকান হচ্ছিল।

"কেন্টের দীর্ঘদেহী বোলার আবার ছুটে আসছেন। বল করার জন্য হাত তুলছেন, বল করছেন—আউট। ম্যাককেব আউট।

অস্ট্রেলিয়ার সাত রানে তিন উইকেট। ম্যাককেব বলের লাইনের পিছনে আসতে পারেনি। স্লিপে হ্যামণ্ড অসাধারণভাবে ক্যাচটি লুফলেন। দর্শকরা আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। আজ শুরু থেকেই তারা উত্তেজনার মধ্যে কাটাচ্ছে। অবস্থাটা খুবই সুখের, ইয়ে খুবই দুঃখের অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে। তবে এই বিপর্যয় তাঁরা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠবেন, পূর্বের নজীর থেকেই এই আশা পোষণ করছি। ব্র্যাডম্যান তো এখন রয়েছেনই।"

প্রথমে ধীরে তারপরই সজোরে ঠোঙা ঝাঁকানো হল (ম্যাককেবের প্রস্থান ও ব্র্যাডম্যানের আগমন সূচিত করে।)

"এইবার ডন নেমেছেন। মন্থর গতিতে তিনি এগোচ্ছেন। তাঁকে স্বাগতধ্বনি আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার এই বিরাট প্রতিভাধর খেলোয়াড়কে আজ কঠিন সংগ্রামে নামতে হবে, এমন সংগ্রাম যা তাঁর চমকপ্রদ খেলোয়াড় জীবনে কখন করতে হয়নি।"

"চমকপ্রদ খেলোয়াড় জীবন! নিজের দেশকে ডুবিয়েছে হতভাগা। এই পীচে আগে কখনো ব্যাট করে? ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং হলে কি এই কাজ করত? হ্যাঁ ক্যাপটেন ছিল বটে?"

"ব্র্যাডম্যান এখন ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলছেন। এখন এই দুজনের ঘাড়ে যে বিরাট দায়িত্ব চেপেছে তা সহজেই বোঝা যায়। সাত রানে তিন উইকেট। ফার্নেস বল করবেন ব্র্যাডম্যানকে। ব্র্যাডম্যান ব্লক নিয়েছেন। বুটের স্প্রিগ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটলেন। ডান হাতে ব্যাটটি তুলে ধরেছেন দর্শকদের সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে। এবার টুপি ঠিক করছেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন লেগ সাইডের ফিল্ডারদের। এবার তিনি প্রস্তুত। ফার্নেস ছুটে আসছেন, বল করলেন। সুন্দর বল। ব্র্যাডম্যান মিড উইকেটে ঠেলে দিয়ে রান নেবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ফার্নেস

আবার বল করতে আসছেন, ওহ্ অফ স্টাম্পের বহু বাইরে। বলটি বেরিয়ে যাবার পর ব্র্যাডম্যান বিরক্ত হয়েই যেন ব্যাট চালালেন। ফার্নেসের এবারের বলটি অল্পের জন্য স্টাম্প স্পর্শ করল না। ব্র্যাডম্যানকে ভাবিত দেখাচ্ছে। তাঁর মুচকি হাসিটি মিলিয়ে গেছে।"

যতক্ষণ রিলে হচ্ছে দেখা গেল, স্যার টমাস দু-হাতে মাথা চেপে মেঝেয় তাকিয়ে। লাউঞ্জের অন্যান্যরা বজ্রাহতের মত।

তখন প্যাক্সটনের বোন তার দাদাকে বলল, "এইভাবে চললে কিন্তু লোকসান হবে। খাবার ইচ্ছে উবে গেছে সকলের।"

প্যাক্সটন বুঝল খেলার মোড় না ঘোরালে সমূহ ক্ষতি। তাই সে শুরু করল, "বিল ব্রাউন অসাধারণভাবে খেলে যাচ্ছেন। লর্ডস টেস্টে তিনি ২০৬ করেছিলেন তা আপনারা জানেন। আর সঙ্কটকালে ব্র্যাডম্যান ছাড়া আর কাকেই বা ভাবা যায়। ফার্নেস ওভারের শেষ বলটি করতে আসছেন। হুক করেছেন। চার রান, ব্র্যাডম্যানের চার রান। এবার নিকলস বল করবেন ব্রাউনকে। ওহ্ কি সুন্দর স্কোয়ার কাট। ওরা তিন রান নিয়েছেন, আর একটি? না, ব্রাউন ফেরৎ পাঠালেন ব্র্যাডম্যানকে। নিকলস দ্বিতীয় বল করলেন। বলটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ব্র্যাডম্যান ব্যাটটা তুলে ধরলেন। এডরিচ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ক্যাচ আউটের আবেদন করেছেন ইংল্যাণ্ড দল। আম্পায়ার দুজন আলোচনা করছেন। এখুনি আমরা জানতে পারব ফলাফল। হ্যাঁ আম্পায়ার হাত তুলেছেন, ব্র্যাডম্যান আউট। অস্ট্রেলিয়া ১৪ রানে চার। দর্শকরা উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন।"

এই সময় দেখা গেল লেখা ফুরিয়ে এসেছে। আর রিলে চালানো যাবে না। ম্যাঞ্চেস্টারের কুখ্যাত আবহাওয়ার শরণ নেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে প্যাক্সটন তখন ঠিক করল।

"ব্র্যাডম্যান ফিরে যাচ্ছেন। এখন বৃষ্টি নামল। ব্রাউন আবেদন জানালেন আম্পায়ারের কাছে। বৃষ্টি বেশ জোরে শুরু হল।

আম্পায়াররা বেল তুলে নিয়েছেন। খেলোয়াড়রা প্যাভেলিয়ানের দিকে ছুটছেন। দর্শকরা চীৎকার করে খেলা চালাতে বলছে। তবে আমার মনে হয় এই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ করে ঠিক করা হয়েছে। আলো কমে এসেছে। বৃষ্টি না পড়লেও খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হত। অস্ট্রেলিয়া ১৪ রানে চার উইকেট হারিয়েছে। এখন আমরা বি বি সি-র লণ্ডন স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি।"

পরদিন স্যার টমাস কুম্ব এসপ্ল্যানেডে এসে যা করেছিলেন তার সঙ্গে ক্রিকেটের কোন সম্পর্ক ছিলনা বলেই, সে কথা আর লিখলাম না।

□ হারান-প্রাপ্তি □

প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগের কথা।

মেলবোর্ণ মাঠে ভিক্টোরিয়া বনাম এম সি সি-র খেলা হচ্ছে। একটি ছোট্ট ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে খেলা দেখতে এসেছে। টিকিটের পয়সা নেই। ঘেরা মাঠের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা পেল যেখান থেকে স্কোরবোর্ডটি দেখা যায়। সেখানে বসে সারাদিন স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি খেলা দেখল এবং ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং-এর একটি সেঞ্চুরি করাও শুনল।

এই ক্রিকেট পাগল ছেলেটি বড় হয়েও তার স্বভাব ছাড়তে পারেনি; এমনকি প্রায় সতেরো বছর প্রধানমন্ত্রীত্ব করেও। এখন এই ছেলেটির নাম স্যার রবার্ট মেঞ্জিস, কে টি. সি এইচ. কিউ সি। কমনওয়েলথে তাঁকে বলা হত "ক্রিকেটিং প্রাইম মিনিস্টার।" একবার একটি প্রবন্ধে সখেদে তিনি বলেছিলেন,—"হায় রে বাল্যকাল! কি আরামেই না গাছের তলায় বসে স্যাণ্ডুইচ খেতে খেতে স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়ে খেলা দেখতাম। আর এখন মাঠের সেরা আসনটি আমার জন্য বরাদ্দ তবু সে সুখ আর পাই না। এখন ভি আই পি হয়ে গেছি। ধ্রুপদী সঙ্গীত শোনার মত ক্রিকেটও মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেখতে হয় অথচ এমন সব লোক এখন চারপাশে ভীড় করে থাকে, ক্রিকেট খেলা দেখা ব্যাপারটা যে ললিত কলারই অন্যতম শাখা, তা ভুলে যেতে হয়।"

মেলবোর্ণে একবার টেস্ট খেলা দেখছেন। ছ'পাশে দুজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক। মেঞ্জিস সবে খেলায় মন বসিয়েছেন তখন

ডানদিকেরজন শুরু করল, পৃথিবীর যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে তাই নিয়ে বাগাড়ম্বর। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও উইকেট পাচ্ছে না। মেঞ্জিস বিরক্তি চেপে, চুপ করেই রইলেন। তখন অন্যজন শুরু করল—আচ্ছা এখন জাতির সামনে সব থেকে কোন সমস্যাটা জরুরী বলে আপনার মনে হয়? গম্ভীর ভাবে মেঞ্জিস জবাব দিলেন "লাঞ্চের আগেই একটা উইকেট ফেলা।"

এই কথা বলেই মেঞ্জিস সেখান থেকে উঠে আর এক জায়গায় গিয়ে বসেন। আগামী নির্বাচনে তিনি দুটি ভোট যে হারালেন সে সম্পর্কে তখন তিনি স্থিরনিশ্চিত। তবে এই ক্রিকেটই তাঁকে একবার একটি মামলা জিতিয়ে দিয়েছিল।

মেঞ্জিস তখন ভিক্টোরিয়া আদালতে ওকালতী করেন। এক দেওয়ানী মামলায় আসামী পক্ষের হয়ে নেমেছেন। তাঁর মক্কেলটি বোকা ধরনের। গুছিয়ে হিসেব করে সে বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে পারে না। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা শেষ হতেই জজ সাহেব বললেন, "মিঃ মেঞ্জিস, আমি না বলে পারছি না, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের কথা কিন্তু খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে।"

মেঞ্জিস তাড়াতাড়ি বললেন, "ইওর অনার, যতক্ষণ না আমার মক্কেলের বক্তব্য আপনি শুনছেন, অনুরোধ করব আপনার বিচারের রায় মুলতুবী রাখার জন্য। আমার বিশ্বাস, আমার মক্কেলও আপনার মনে দাগ কাটতে পারবে।"

জজ সাহেব বেশ বুড়ো মানুষ। কোনকালেই নামকরা আইনজীবী ছিলেন না, তবে এক সময়ে মোটামুটি ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে নাম ছিল। তাঁকে আকৃষ্ট করা যায় তিনটি বিষয়ের দ্বারা—গোলাপ ফুল, হাঁস-মুরগীর চাষ আর ক্রিকেট। ওকালতীতে সফল হতে হলে উকীলমাত্রেরই জজদের দুর্বলতাগুলির

খোঁজখবর রাখতে হয়। মেঞ্জিসও তাই বৃদ্ধ জজের এই তিনটি রন্ধ্রের খবর রাখতেন।

এরপর উকীল ও মক্কেলের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তা তুলে দেওয়া হল।

"কখনো গোলাপ চাষ করেছেন?"

"আজ্ঞে আমার বৌ বোধহয় বাগানে দু একটা গাছ পুঁতেছিল।"

"লা বেলে ফ্রাঁস আর ফ্রাউ কার্ল ড্রুসকির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন?"

"উহুঁ।"

"বাড়িতে মোরগ পোষেন?"

"আজ্ঞে, বৌ দু চারটে পোষে।"

"সাদা লেগহর্ন আর অরপিংটনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন?"

"জন্মেও পারব না।"

"আপনি কি কখনো ক্রিকেট খেলেছেন?"

"অ্যাইয়ো, এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আইভো ব্লাই যখন ইংল্যাণ্ড থেকে তার দল নিয়ে এলো, বলারাট অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টের হয়ে ওদের সঙ্গে খেলেছি।"

"বেশ বেশ, আজ তাহলে এই পর্যন্ত।"

পরদিন আসামী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তার উকীল মেঞ্জিস নানান কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে একটা তারিখ সম্পর্কে ওকে প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিতে যাবে, তার আগেই মেঞ্জিস আবার বললেন, "তাড়াহুড়ো করবেন না। ভেবেচিন্তেই বলুন। তারিখ মনে রাখাটা ভারী শক্ত ব্যাপার। তবে কিছু কিছু তারিখ মনে থেকেই যায় যেমন ধরুন, যদি জিজ্ঞাসা করি, আইভো ব্লাইয়ের দলের বিরুদ্ধে বলারাট অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টের হয়ে যে খেলেছিলেন তার তারিখ কত, নিশ্চয় বলতে পারবেন।"

"তাই নাকি, তাই নাকি।" জজ সাহেব উত্তেজনায় সিধে হয়ে বসলেন "তা খেলাটা কি রকম হয়েছিল বলুন তো? ভাল কথা, আপনি বোলার না ব্যাটসম্যান ছিলেন?"

এরপর জজ এবং সাক্ষী প্রায় আধঘন্টা ধরে শুধু গল্পই করে গেলেন ক্রিকেটের। আদালত ঘরের অনেকেই তাতে যোগ দিলেন। এরপর অবশ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হল। জজ তখন হতভম্ব ফরিয়াদী পক্ষের উকিলকে বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে একে জেরা করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে এত বছর জজিয়তী করছি কিন্তু এমনভাবে কোন সাক্ষী আমার মনে দাগ কাটতে পারেনি।"

এ মামলায় কে জয়ী হয়েছিল তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা করে না। আসামী যে নিরপরাধ ছিল সেটাও সত্যি ঘটনা। "তবু" স্যার রবার্ট মেঞ্জিস এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সে মামলা জিতিয়ে দিয়েছিল ক্রিকেটই"।

☐ আইন জেনে ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ ☐

অল্পবিস্তর আইন জেনে সমাজে বাস করা যায়, কিন্তু পুরোদস্তুর আইন না জেনে কোন খেলাই খেলা যায়না। বেশির ভাগই অবশ্য অল্প আইন জেনেই খেলে থাকে এবং খেলে চলেছেও, কিন্তু তার ফলে কত সুযোগ-সুবিধার আদায় থেকে তারা যে বঞ্চিত হয় নিজেরা এবং দলও, তার হিসাব রাখা হয়না। অজান্তে আইন লঙ্ঘন করে খেলার চূড়ান্ত মুহূর্তে বিপর্যয় ডেকে আনে যে কত খেলোয়াড় তার সংখ্যাও হিসেব করে রাখা হয়নি।

উপরোক্ত কথাগুলি সবথেকে সত্যি ক্রিকেটের ক্ষেত্রে। ডন ব্র্যাডম্যানের কথাটি মনে পড়ে যায়—“প্রত্যেক তরুণ ক্রিকেটারের কাছে আমার উপদেশ, যতটা সম্ভব ক্রিকেট আইনগুলি তারা যেন মনে গেঁথে রাখে, কেননা খেলার মধ্যে কখন কি জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না।” ব্র্যাডম্যান শুধু উপদেশই দেননি, আম্পায়ারিং পরীক্ষাও পাশ করেন এবং তখন মাত্র ১০টি টেস্ট ম্যাচ তিনি খেলেছেন।

আইন জানার কোন বয়স নেই। খেলোয়াড় যত বড় এবং খ্যাতনামাই হোননা কেন, তিনি যে সবজান্তা হবেন এমন কোন কথা নেই। শুধু ব্যাটম্যানই নন্, রঞ্জিত সিংহজীও লিখেছেন, “মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, খেলোয়াড় জীবনের প্রথম দিকে যদি আম্পায়ারিং করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। অন্তত একবার তাহলে আমার উইকেটটি রক্ষা পেত।

“১৮৯০ সালে ইংল্যাণ্ডে আমার ক্রিকেট খেলার প্রথম বছরে,

কেমব্রিজে একটি খেলায় ব্যাট করছি। বল মেরেছি লেগে, দুটি রানও নিয়েছি। ফিল্ডার বল ছুঁড়ে বোলারের উইকেটে মেরেছে, বলটি তার ফলে গজ দশেক দূরে ছিটকে গেছে। তখন রান নেবার জন্য অন্য ব্যাটসম্যানটিকে ডাক দিয়েই ধীরে অন্য প্রান্তের দিকে রওনা হলাম। ইতিমধ্যে এক ফিল্ডার বল ছুঁড়ে দিল বোলারকে। বোলার বলধরা হাতে একটি স্টাম্প মাটি থেকে তুলে নিয়ে আবেদন জানাল, আর আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম আম্পায়ার আমাকে আউট দিলেন। আমার ধারণা ছিল, উইকেট থেকে বেল পড়ে গেলে সেই বেল আবার উইকেটের উপর সাজিয়ে তবেই রান আউট করা যাবে!"

টেস্ট ক্রিকেটের কথায় আসা যাক্। লেন হাটনের মত অতবড় খেলোয়াড়ও জরিমানা দিয়ে ওভালে ১৯৩৮-এর পঞ্চম টেস্ট থেকে একটি আইন শিখেছিলেন। এই খেলাতেই তিনি ৩৬৪ করেন। অষ্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল ব্রাউন খেলছেন শেষ ব্যাটস-ম্যান ফ্লিটউড-স্মিথের সঙ্গে। তাকে আড়াল করার জন্য ব্রাউন প্রতি ওভারের শেষে একটি রান নিয়ে আবার পরের ওভারের বোলিংয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন। একটি ওভারের শেষে ব্রাউন বল মেরে রান নেবার জন্য দৌড়েছেন। বল পৌঁছেছে হাটনের কাছে। হাটন বলটি না ধরে লাথি মেরে বাউণ্ডারী পার করে দিলেন। চার রান হলে ব্রাউন অপরপ্রান্তে ব্যাট করার আর সুযোগ পাবেন না, এই উদ্দেশ্যেই হাটন ইচ্ছা করেই এই কাজটি করেন। কিন্তু ২০ আইনের এক জায়গায় লেখা আছে, "কোন ফিল্ডসম্যানের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য বাউণ্ডারী হলে যতগুলি রান আগেই নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বাউণ্ডারীর জন্য প্রদেয় রান একত্র স্কোরে যুক্ত হবে।"

আইনানুসারে আম্পায়ার, ব্যাট দিয়ে খেলা একটি রান ছাড়াও, লাথিমেরে বাউণ্ডারীর চারটি রানও ব্রাউনকে দেন, উপরন্তু অপর প্রান্তে ব্যাট করার অধিকারও ব্রাউন লাভ করেন। এই বিল

ব্রাউনই আবার আইন ভুলে যাবার জন্য নিজের উইকেট খেসারত দেন দশ বছর পর সিডনী টেস্টে।

ব্রাউন যখন নন-স্ট্রাইকার, তখন রান নেবার জন্য বোলার বল করার আগেই ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বোলার বিন্নু মাঁকড় ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন ও রান আউট করে দেন। মাঁকড় হুঁশিয়ারী না দিয়েই এ কাজ করেন কারণ এক মাস আগে এই মাঠেই অস্ট্রেলীয় একাদশের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলায়, ব্রাউন এই ব্যাপারই করছিলেন। মাঁকড় তখন এই ভাবেই তাকে রান আউট করে দেন কিন্তু তার আগে ব্রাউনকে সৌজন্যবশত হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

এইভাবে রান আউট করার আগে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে—আইনে এমন কথা লেখা নেই। মাঁকড় আইনটি জানতেন, তাই সুযোগটি গ্রহণ করে ব্রাউনের মত দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যানকে আউট করে দলের সামনে থেকে একটি বাধা সরিয়ে দেন। অল্প বয়স থেকেই ব্রাউন যদি এই আইনটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতেন তাহলে ৩৬ বছর বয়সে ১৯তম টেস্ট খেলায় এইভাবে আউট হতেন না।

সৌজন্য, শিষ্টাচার, শালীনতার সঙ্গে ক্রিকেট শব্দটি সমার্থক হয়ে গেছে। আইনে নেই তবু বহু রীতি ক্রিকেটে মান্য করা হয়। না মানলে আইনে কিছুই বলার নেই কিন্তু লোকে নিন্দা করে। মাঁকড় আগের খেলায় হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। একবার একটি খেলায় লর্ড হ্যারিস (পরে বোম্বাইয়ের গভর্ণর হন) বল করতে করতে নন-স্ট্রাইকারের ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে, তাকে হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু ব্যাটসম্যান তাতে কর্ণপাত করে না। পরেরবার হ্যারিস এমন ব্যাপার দেখেই উইকেট ভেঙ্গে দেন বল দিয়ে এবং বলেন, "আপনি যদি আবার এমন কাজ করেন, তাহলে কিন্তু পরের বার আবেদন করব।"

অনেকেই জানেন না, যতক্ষণনা ফিল্ডিং দলের কেউ আবেদন করছে, ততক্ষণ আম্পায়ার আউট ঘোষণা করতে পারেন না। শিষ্টচার বা সৌজন্য যে লর্ড হ্যারিসের মত লোকদের দ্বারা সব-সময়ই পালিত হবে, একথা ভেবে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। জেতার বা হার এড়াবার জন্য আইনানুগ সব পন্থাই বিপক্ষদল গ্রহণ করবে, এটাই ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। কাজেই বিনা অনুরোধে ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে বোলারকে ফেরৎ দেওয়ামাত্র বিপক্ষ দল ৩৬ আইন অনুসারে আউটের জন্য আবেদন জানালে হতভাগ্য ব্যাটসম্যান বিপক্ষের সৌজন্যবোধের অভাব বিষয়ে মন্তব্য করতে পারেন মাত্র, কিন্তু উইকেট থেকে ফিরে আসতেই হবে।

আইনে লেখা নেই সাবস্টিটিউট বা পরিবর্ত ফিল্ডার উইকেট রক্ষার কাজ করতে পারবেনা। কিন্তু লেখা আছে "যে ব্যক্তি পরিবর্তরূপে ফিল্ড করতে নামবে তাঁর সম্পর্কে বিপক্ষ অধিনায়কের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে। পরিবর্ত কোথায় ফিল্ড করতে পারবেন না—এই নির্দেশ তিনি দিতে পারবেন।"

শেষবাক্য বলে ব্যাটিং অধিনায়ক ইচ্ছা করলে পরিবর্তকে উইকেটের পিছনে (এমনকি স্লিপেও) দাঁড়াতে দিতে পারেন বা নাও পারেন। নিউজিল্যাণ্ডের জারভিস মারাত্মক স্লিপ ফিল্ডার। বোম্বাই টেস্টে (১৯৬৫) পতৌদি তাকে পরিবর্ত ফিল্ডার রূপে স্লিপে দাঁড়াতে দেননি। বস্তুত পরিবর্ত ফিল্ডারের উইকেট রক্ষার নজীর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বেশ কয়েকটি আছে। টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ডের পরিবর্ত উইকেট রক্ষক টাফনেল দক্ষিণ আফ্রিকার স্নুককে স্টাম্প আউট করেছিলেন ডারবানে, ১৯০৯-১০-এ।

আহত বা অসমর্থ ব্যাটসম্যানের জন্য পরিবর্ত রানার হিসাবে কে নামতে পারবেনা, ফিল্ডিং অধিনায়ক তা বলে দিতে পারেন। ১৯৫৭-৫৮ ওয়েষ্ট ইনডিজ-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজে রোহান কানহাইয়ের পায়ের পেশীতে টান ধরলে কনরাড হাণ্ট পরিবর্ত

রানার হিসাবে নামেন। পাক অধিনায়ক কারদার এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, হাণ্ট উইকেটদ্বয়ের মধ্যে খুব দ্রুত দৌড়তে পারেন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেই সুযোগটি নিতে চায়। ভারত-অস্ট্রেলীয় টেস্ট সিরিজে ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টে চাঁদু বোড়ে, অসমর্থ হওয়ায় আবিদ আলি পরিবর্ত রানার হিসাবে নামায় বিল লরী কারদারের মত একই যুক্তিতে আপত্তি জানাবেন ভেবেও জানাননি নিছকই ভদ্রতাবশত।

টেস্ট বা প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার আইন না জানার খেসারত অনেকেই দিয়েছেন। সেই তুলনায় ক্লাব পর্যায়ের লীগ ও নক আউট প্রতিযোগিতায় অজ্ঞতাপ্রসূত কত যে সর্বনাশ ঘটেছে, তার কোন বিবরণ কেউ লেখেননি।

আইন না জানা বা দুর্বল ব্যক্তিত্বের আম্পায়ারদের নিয়েও বহু গল্প (কিন্তু সত্যি) প্রচলিত আছে। আইনের প্রয়োগ ছাড়াও তাদের উপর ন্যস্ত বহু দায়িত্বও আম্পায়ারদের পালন করতে হয়। ব্র্যাডম্যান কথিত—'কখন কি জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটবে'—এমন একটি ঘটনার কথা বলা যায়। ঘটেছিল নিউজিল্যাণ্ডে এক সাধারণ খেলায়। ব্যাটসম্যান বলটি জোরে উঁচুতে মেরেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দু-আধখানা হয়ে গেল বলটি। একখণ্ড ওভার বাউণ্ডারি হল, অপরটি মাটিতে পড়ল। এক্ষেত্রে আম্পায়ার কি করবেন? এমন ঘটনা ঘটলে কি করতে হবে আইনে বলা নেই।

এই খেলার আম্পায়াররা, আবার একটি বল আনিয়ে সেই বোলারকে দিয়ে আবার বল করিয়েছিলেন। খেলার মধ্যে মাঝে মাঝে আম্পায়ারদের বলটি পরীক্ষা করে দেখা উচিত, কি অবস্থায় রয়েছে। যদি আম্পায়াররা তাই করতেন, তাহলে দু-টুকরো হওয়ার মত ব্যাপার ঘটত না। আইনে না বলে দিলেও অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু ভাল করে আইন জানা না থাকলে আবার সে কাজগুলি করা যায় না।

□ আভিকালের ক্রিকেট □

॥ এক ॥

ক্রিকেট খেলার শুরু ইংল্যাণ্ডেই বটে, কিন্তু সন তারিখ দিয়ে কেউই বলতে পারেননি কবে থেকে। খোঁজ খবর নিয়ে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে দেখা যায়, ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম এডোয়ার্ডের পোশাকের হিসাবের খাতায় ল্যাটিন ভাষায় ক্রিকেট প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। সেই ল্যাটিনের অনুবাদটি হল: "রাজপুত্র এডোয়ার্ডের চ্যাপলেন, মাস্টার জন দ্য লীক কর্তৃক ওয়েস্ট মিনস্টারে প্রিন্সের Creag এবং অন্যান্য খেলাধুলার জন্য নিজ হাতে এবং অন্যান্যদের মারফৎ দেয় অর্থ বাবদ ১০০ শিলিং, ১০ মার্চ"

Creag কেই ক্রিকেট বলে ধরে নেওয়া হয়েছে কারণ সেই সময় ইংরাজী ভাষায় কোন নির্দিষ্ট বানান ছিলনা। আর ল্যাটিনেও এমন কোন শব্দ নেই যা হ্রস্ব করে Creag করা যায়। এরপর ক্রিকেটের সন্ধান পাওয়া গেল ১৫৯৮ সালে। জন ডেরউইক নামে জনৈক ব্যক্তি লেখেন, গিল্ডফোর্ডে একটুকরো জমিতে তিনি এবং কয়েকজন মিলে ক্রিকেট খেলতেন। ভদ্রলোকের বয়স তখন ৫৯। এর থেকে একটা জিনিস অনুমান করা যায়, ৫৯ বছরে যে খেলা তিনি খেলতেন, নিশ্চয় বাল্যকালে তার চর্চা করেছিলেন অর্থাৎ ১৫৫০-এর আগে ক্রিকেটের প্রচলন ছিল।

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলেরাই ক্রিকেট খেলত। প্রথম চার্লসের সমর্থক স্যার উইলিয়ম ডাগডেল তাচ্ছিল্যভরে অলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে

বলেছিলেন, ছেলেবেলায় (অর্থাৎ ১৬১৭ সালের কাছাকাছি) ক্রমওয়েল তো "ফুটবল, ক্রিকেট, কুস্তি এবং লাঠি খেলায় খুব নাম করেছিল।" ১৬২২-এ দেখা গেল এলথামের সাতজন লোককে রবিবার ক্রিকেট খেলার জন্য জরিমানা করা হয়েছে দু শিলিং করে (এখনকার দু পাউণ্ড)। এতেই বোঝা যায় ক্রিকেট রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

১৬৭৬-এর ৬ মে, হেনরী টিওঙ্গ নামে নৌবাহিনীর এক চ্যাপলেন সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছাকাছি এক উপত্যকায় তিনটি যুদ্ধজাহাজের নাবিকদের মধ্যথেকে দল করে ক্রিকেট খেলেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বাইরে এইটিই প্রথম ক্রিকেট খেলা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ক্রিকেটে ভদ্রলোকদের উৎসাহ দেখা যায়। কারণটা সম্ভবতঃ রয়্যালিস্টদের পিছু হটার সময় (১৬৪৯-৬০) এরা গ্রামের জমিদারীতে নির্বাসিত হন। সেখানে তারা গ্রাম্য খেলাধুলায় রপ্ত হন। দ্বিতীয় চার্লসের পুনরুদ্ধার ঘটলে, এইসব ভদ্রলোকেরা লণ্ডনে ফিরে আসেন, ক্রিকেটও তাদের সঙ্গে আসে। ভদ্রলোকদের মধ্যে জুয়াখেলা একটা ফ্যাশন ছিল, ক্রিকেটের উপরও তারা বাজী ধরতেন, সুতরাং এই খেলার উপর অনেকেরই নজর পড়ল এমনকি তৎকালিন সংবাদপত্রগুলিরও।

১৭০০ সালে 'পোস্ট বয়' পত্রিকায়, বিজ্ঞাপিত হল, "ইস্টারের সোমবারে ক্ল্যাপহাম কমনে একটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে।" পাঁচটি গেম হবে, প্রতিটির বিজয়ী ১০ পাউণ্ড পাবে, যেটিতে ফলাফল নির্ধারিত হবে তার বিজয়ী পাবে ২০ পাউণ্ড।

ক্রিকেট খেলার সব থেকে প্রাচীন বিবরণ ল্যাটিনে লেখা একটি কবিতা। কেম্ব্রিজের কিংস কলেজের ছাত্র উইলিয়াম গোল্ড উইন ১৭০০ সালে ঐটি লেখে। ১৭০৬ সালে প্রকাশিত একটি কবিতার বইয়ে এটি স্থান পায়। ১৯২২-এ এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

তখনকার আমলে ক্রিকেট পীচ দৈর্ঘ্যে এখনকার মত বাইশ গজই ছিল। তবে তিনটির বদলে দুটি স্টাম্প ব্যবহৃত হত। উচ্চতায় ২২ ইঞ্চি, চওড়ায় ৬ ইঞ্চি। মাথায় বেল থাকত। বেল না ফেলে যদি দুই স্টাম্পের মাঝ দিয়ে বল চলে যেত, তাহলে নট আউট। তবে সে আমলে মাঠের এবড়ো-খেবড়ো অবস্থা এবং কিম্ভূত ব্যাটের জন্য খুব অল্প রান উঠত। কিন্তু ব্যাটিং কলাকৌশলের উন্নতি ঘটতে থাকায় ব্যাটসম্যানকে আউট করা বেশ শক্ত হয়ে পড়তে লাগল। ১৭৭৬ সালে তৃতীয় স্টাম্প ব্যবহার করা হল। ১৭৯৮-এ স্টাম্পগুলো দু ইঞ্চি উঁচু এক ইঞ্চি চওড়া করা হল, ১৮১৯-এ আর একটু বাড়ল, বর্তমান আকৃতি ১৯৩১ সালে প্রচলিত হয়েছে।

আগে উইকেট এবং ক্রীজের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৪৬ ইঞ্চি (এখন ৪৮ ইঞ্চি)। ক্রীজ কথাটা এসেছে স্ক্র্যাচ (Scratch) থেকে। তখন খড়ির দাগ দেওয়া হতনা, জমিতে আঁচড় কাটা হত। ক্রীজের মাঝখানে ব্লক অথবা গর্ত থাকত। রান নেবার সময়, ব্যাটসম্যান পৌঁছবার আগেই উইকেটকীপার যদি গর্তের মধ্যে বল ফেলে দেয়, তাহলেই রান আউট। এখনকার ব্যাটসম্যানরা পপিং ক্রীজের পিছনে যে দাঁড়িয়ে থাকে, তা এইজন্যই।

গোল্ডউইনের কবিতা থেকে জানা যায়, ব্যাটসম্যানরা রান নেবার সময় ব্যাটটা মাটিতে না ঠেকিয়ে আম্পায়ারের গায়ে ঠেকাতেন অর্থাৎ রানটাকে একেবারে সাক্ষীসাবুদসহ পোক্ত করে নিতেন। এজন্য দুদিকের আম্পায়ারই উইকেটের ধারে দাঁড়াতেন। ব্যাটসম্যান পরিত্রাহি দৌড়ে এসে খটাস করে পায়ের গোছে ব্যাট লাগাচ্ছে—এ দৃশ্য কল্পনা করতে এখন হাসি পাবে, কিন্তু তখনকার দিনের আম্পায়ারিং রীতি যদি আজও চালু থাকত? তখন ওরা করতেন কি, হাত বাড়িয়ে আগেই ব্যাটটাকে ছুঁয়ে পা বাঁচাতেন।

আম্পায়ার কথাটার অর্থ বিজোড় সংখ্যার লোক। তখন বারোজন নিয়ে দল হত অর্থাৎ ডজন। এরমধ্যে থেকে একজন

বাদ পড়ত আম্পায়ারিংয়ের জন্য। এখনকার খেলায় এগার-জনের যে দল তৈরী হয়, তার এইভাবেই শুরু।

স্কোর লিখত দুজন। একটা কাঠের টুকরোয় ছুরি দিয়ে আঁচড় কেটে স্কোর রাখত। ব্যক্তিগত রানসংখ্যা রাখার রেওয়াজ ছিল না। অল্প রান উঠত, কাজেই একটা কাঠেই কুলিয়ে যেত। পরে জনসাধারণের উৎসাহ বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য আলাদা কাঠ রাখা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কাগজ-কলমের ব্যবহার শুরু হল। এর কারণও আছে, আগে গ্রামের দিকে লিখতে পড়তে জানা লোক পাওয়াই যেত না, আঁচড় কাটাতেই সুবিধা ছিল।

সে আমলে ক্রিকেটের পীঠস্থান ছিল কেণ্ট। ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে দল নিয়ে লণ্ডনে খেলতে যেতেন। ১৭৪৪-এ কেণ্ট বনাম সম্মিলিত ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এক খেলা হয়। ইংল্যাণ্ড দল ৪০ এবং ৭০ রান করে কেণ্ট ৫৩ এবং শেষ ইনিংসে নয় উইকেটে ৫৫ অর্থাৎ জয়লাভের জন্য যখন তিন রান বাকি তখন শেষ ব্যাটসম্যান ক্যাচ তুলল, ফিল্ডাররা ধরতে পারল না। সারা মাঠে প্রবল উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত কেণ্ট জিতল। এই খেলা থেকেই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৫১-য় বুকে ক্রিকেট বল লেগে ফ্রেডারিক প্রিন্স অব ওয়েলস মারা যান।

খেলার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও দেখা দেয়। অনেকেই আক্ষেপ শুরু করেন জাত-জন্ম রইল না, ভদ্দরলোক-ছোটলোকে মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে, মজুররা কাজ ফাঁকি দিয়ে খেলতে লেগেছে, জুয়া খেলাও বেড়েছে। শেষের অভিযোগটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। তবে ক্রিকেট উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৭৫০-এর কাছাকাছি এক সময়ে ক্রিকেটের প্রথম, হ্যাম্বলডন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ দুই ॥

ক্রিকেট খেলার শুরু কিভাবে হল, তাই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে যুক্তিসঙ্গত বলে যেটিকে মনে হয় তা হল, রাখাল ছেলেরা অবসর কাটার উপায় খুঁজতে খুঁজতে একদিন ক্রিকেট আবিষ্কার করে ফেলে। মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডে মেষপালন বেশ একটা লাভজনক ব্যাপার ছিল। ভেড়া চরাতে রাখাল ছেলেরা মাঠঘাট, বনবাদাড়ে সারাটা দিনই কাটাত। নিশ্চয় এই সময়টা শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত তারা থাকত না। ঝগড়াঝাটি মারপিট হত। ভেড়া চরাবার লাঠি, যার একদিকটা বাঁকান, তাই নিয়ে তেড়ে যেত। লাঠির বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র ঢিল। দূর থেকে ঢিল ছুঁড়লে লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা হত।

ব্যাপারটা ক্রমশ খেলায় দাঁড়ায়। তবে শরীর লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে, সবকটাই যে লাঠিতে আটকানো যাবে তার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং শরীরের বদলে অন্যকোন বস্তু থাকলে, শরীরও বাঁচে, ব্যাপারটায় মজাও থাকে। অতএব শরীরের বিকল্প বস্তু খুঁজে বার করা হল। অনুমান করা হয়, কেণ্ট এবং সাসেক্সের অন্তগত ওয়েল্ডের বনে রাখাল ছেলেরা প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু করে। কাটা গাছের গুঁড়ি, ইংরাজীতে যার নাম স্টাম্প, তাই লক্ষ্য করে খেলা শুরু হয়।

খেলাটা ওয়েল্ডের কাছে ডাউনস-এ রাখাল ছেলেদের মধ্যে খুব চালু হয়ে যায়। ডাউনস অর্থাৎ খোলা জমি, বনজঙ্গল নেই শুধু ঘাস আর ঘাস। মুশকিল হল, কাটাগাছের গুঁড়ি বা স্টাম্প এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। ভেড়া থাকার খোঁয়াড় আছে। তার বেড়ার দরজাকে বলা হয় উইকেট গেট।

তাঁর মাথায় খিল, খিলের নাম বেল। এই উইকেটকে লক্ষ্যবস্তু করে ডাউনল্যাণ্ডের এবং স্টাম্পকে লক্ষ্যবস্তু করে উডল্যাণ্ডের ছেলেরা খেলতে শুরু করে। স্টাম্প রক্ষা করতে যে দাঁড়াত, তার হাতে থাকত মোটা ভারী কাঠ বা ব্যাট কেল্টিক ভাষায় ব্যাটের সমার্থক শব্দ লাঠি বা দণ্ড। রাখাল ছেলেরা খেলত বাঁকা লাঠি নিয়ে, ইংরাজীতে তাকে বলা হয় 'ক্রুক'। প্রাচীন ইংরাজীতে কথাটা সম্ভবত 'ক্রিক' বলে উচ্চারিত হত। শব্দটা এখনো আমরা ব্যবহার করিঃ ঘাড় বাঁকা হয়ে মুচড়ে গেলে যে যন্ত্রণা হয় তাকে, বলি 'ক্রিক ইন দি নেক।' সুতরাং ক্রিকেট এবং ব্যাট এই দুটো শব্দের অর্থ একই। ক্রিকেট ব্যাট বলার কোন দরকার নেই। তাই বলে কেউ যদি এখন 'ব্যাট করছে' বলার বদলে 'ক্রিকেট করছে' বলে তা হলে অনর্থ দেখা দেবে। শব্দের অর্থ বদলেছে। লোকে যা মেনে নিয়েছে সেইভাবেই চলা ভাল।

ক্রিকেটের গোড়ার যুগে আণ্ডারহ্যাণ্ড বল করা হত। একদম মাটি ঘেঁষে গড়িয়ে। হকিস্টিকের মত বাঁকা ব্যাটে এই ধরনের বল খেলায় সুবিধাই ছিল। চষা জমিতে খেলতে অসুবিধা হত তাই, ভেড়ায় মুড়োনো ঘাসওলা জমিতে খেলা হত।

এবারে হ্যাম্বলডন ক্লাবের কথায় আসা যাক। ঠিক কবে যে এই ক্লাবের পত্তন হয় তা জানা যায় নি। ১৭৫৬-এ ফিন্সবেরীর আর্টিলারি গ্রাউণ্ডে ডার্টফোর্ডের একটি দলের সঙ্গে এই ক্লাবের খেলার কথা প্রথম জানা গেছে। এর দশবছর পর থেকেই হ্যাম্বলডনের নাম ছড়িয়ে পড়ে। সারে এবং হ্যাম্পশায়ারের সীমান্তবর্তী এই ছোট্ট গ্রামটির ক্রিকেটদল তখন লণ্ডনে গিয়ে খেলে আসার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখত। এরও পরে এই ক্লাব ইংল্যাণ্ডের বাছাই দলকে বহুবার অনায়াসে হারিয়েছে।

এই ক্লাব সম্পর্কে যা কিছু এখন জানা গেছে, তা ১৮৩৫-এ প্রকাশিত "ইয়ং ক্রিকেটার্স টিউটর" নামে একটি বই থেকে। এর

লেখক হলেন, জন নাইরেন। সেকালের নেভিল কার্ডাস। নাইরেন জন্মান ১৭৬৪ সালে। ওর বাবা রিচার্ড নাইরেন ছিলেন হ্যাম্বলডন ক্লাবের 'সেনাপতি'। ১৭৯১-তে তিনি ক্লাব ছাড়েন। ক্লাবও তারপর ভেঙে যায়।

হ্যাম্বলডনের খেলোয়াড়রা ছিলেন, কৃষক, চর্মকার, সরাইখানাওলা, মজুর, মিস্ত্রী ইত্যাদি। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ডরসেটের ডিউক এবং স্যার হোরেস মান। ক্লাবের সদস্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা। খেলোয়াড়রা সবাই ছিলেন পেশাদার, খেলারমাঠ ছিল ব্রড হাফপেনী ডাউন-এ। কাছেই ছিল এক সরাই, নাম 'দি ব্যাট অ্যাণ্ড বল।' সরাইটি এখনো আছে। গ্রামের আরোকাছে আর একটি মাঠে পরে খেলা হত।

তখনকার খেলার বর্ণনা জন নাইরেনের লেখায় পাওয়া যায়। অংশ তুলে দিচ্ছি: "তখন, কাউন্টির অর্ধেক লোক জমা হয়েছে, তাদের হৃদয় আমাদের (অর্থাৎ খেলোয়াড়দের) জন্য উজাড় করা। লিটল হ্যাম্বলডন খেলেছে কিনা ইংল্যাণ্ডের বাছাই দলের সঙ্গে! হ্যাম্পশায়ারের লোকেরা এর থেকে গর্বের কিছু আছে বলে ভাবতেই পারে না। এ খেলায় হেরে গেলেও একধরনের মর্যাদা আছে। আর জিতলে, মনে হত "দেবদূতের ঠিক পরের স্তরে" রয়েছি।....ধৈর্য আর উত্তেজনা নিয়ে কৃষকদের মুখগুলো খেলার ভাগ্য-পরীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত আকুল হয়ে লক্ষ্য করত। ঘটনাটা যেন দুই যুযুধান সৈন্যদল নিজেদের স্বাধীনতার মীমাংসায় ব্যস্ত। হ্যাম্বলডনের কেউ যদি চার বা পাঁচ রান নেবার মত কষে ব্যাট হাঁকায়, তা হলেই খাঁটি হ্যাম্পশায়ারী চীৎকার উঠত। সাধারণভাবে প্রাদেশিকতা বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থাকলেও হ্যাম্বলডনের মানুষদের সম্পর্কে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তারা অখেলোয়াড় ছিল না। প্রতিপক্ষের মারা বল দর্শকরা ইচ্ছে করে আটকে দিয়েছে, এমন ঘটনা একটিও ঘটে নি।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তখন বাউণ্ডারী বলে কিছু ছিলনা। দৌড়ে যত খুশি, এমন কি দশটি রান পর্যন্ত নেওয়ার ঘটনাও জানা যায়। ১৮৬০ সালেই প্রথম বাউণ্ডারী নির্দিষ্ট করা হয়। এখনো ইংল্যাণ্ডের বহু স্কুলের জুনিয়র খেলায় বাউণ্ডারী রাখা হয়না। এ সম্পর্কে একটি গল্প বলে নিই। সত্যি ঘটনা। খেলা হচ্ছে ইটন স্কুলেরই দুটি দলের মধ্যে। ব্যাট করছে সবথেকে ভাল ব্যাটসম্যানটি। কিছুতেই তাকে আউট করা যাচ্ছে না। ফিল্ডিংপক্ষের মাথার ঘাম পায়ে ঝরতে শুরু করেছে। এমন সময় সজোরে হাঁকড়ানো একটা বল গাছের দুই ডালের মধ্যে অদ্ভুতভাবে আটকে গেল। এবার সেটিকে পেড়ে নিতে পারলেই ক্যাচ আউট। গাছে চড়ায় ওস্তাদ এমন একজন ফিল্ডারকে তুলে দেওয়া হল। সন্তর্পণে, গুটি গুটি সে উঠতে থাকল, একটু নড়লেই টুপ করে বলটি খসে পড়তে পারে তাহলেই সর্বনাশ। বেশি সাবধান হয়েছিল বলেই বোধহয় সর্বনাশটি ঘটে গেল। পা হড়কে বেচারা পড়ে যাচ্ছিল, ডাল ধরে সামলাল, কিন্তু ঝাঁকুনিতে বলটি পড়ে গেল। উইকেট কীপারের হাতে বল যখন পৌঁছল, ব্যাটসম্যান তখন উনত্রিশতম রানটি নেওয়া শেষ করেছে।

কয়েকটা সালের উল্লেখ করে নিই। ১৭১৯-এ প্রথম কাউন্টিম্যাচ খেলা হয় কেণ্ট বনাম লণ্ডন। ১৭২৯-এ তৈরী একটি ক্রিকেট ব্যাট এখন ওভাল প্যাভিলিয়নে রাখা আছে। এরথেকে পুরণো ব্যাট এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৭৩৭-এ আমেরিকার জর্জিয়ায় ক্রিকেট খেলার কথা জানা যায়। ১৭৪৪-এ লণ্ডন ক্লাব কর্তৃক ক্রিকেটের আইন জারী করা হয়। অলিখিতভাবে তখন অবশ্য কিছু আইন ছিল।

॥ তিন ॥

ব্রড হাফপেনী ডাউন-এ যারা খেলতে নামতেন তাদের মধ্যে কে যে 'গ্রেট' ছিলেন তা বলা শক্ত। রিচার্ড নাইরেন ছাড়া যার কথা প্রথমেই মনে আসে, তাঁর নাম জন স্মল। ভাল ব্যাট করতেন, ফিল্ড করতেন, ব্যাট বানাতেন, বেহালা বাজাতেন। খেলায় তার বড় কথা হল ডিফেন্স। সর্ট রান নিতেও ওস্তাদ। ১৭৭২-এ সম্মিলিত ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে তিনদিন ধরে ব্যাট করেছিলেন।

সে আমলে বড় বোলার ছিলেন সারে এবং ইংল্যাণ্ড দলের লাম্পি স্টিভেন্স। নাম শুনলেই ব্যাটসম্যানদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়তে চাইত। লাম্পির সঙ্গে স্মলের বহুবার ব্যাট-বলের লড়াই হয়েছে। হ্যাম্বলডন ক্লাব যখন প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু করে তখন গড়িয়ে বল করা হত। স্টাম্প ছিল মাত্র দুটি। বহুবার স্মলের উইকেটের ফাঁক দিয়ে লাম্পি বল গলিয়েছেন কিন্তু বেল পড়েনি। তৃতীয় স্টাম্প প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৭৭৬ সালে।

সে আমলে বোল্ড আউট করাই ছিল বোলারদের লক্ষ্য। তাই লাম্পি এমনভাবে বল করতেন যাতে মাটি ছেড়ে একটুও না ওঠে। এখন যেমন মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় পিচ তৈরী করা হয়, দু দল এসে খেলে যায়, তখন কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থা ছিলনা। বিরাট মাঠ পড়ে রয়েছে। বাইরে থেকে যারা খেলতে আসে, তারাই দেখে শুনে একটা জায়গা ঠিক করে দেয়, সেখানেই খেলা হয়—এই ছিল তখনকার রীতি।

পিচ স্থির করার ব্যাপারটা লাম্পি নিজেই করতেন। ঢালু গড়ানে জায়গাই বেছে নিতেন। কারণ ঢালু দিকে বল ফেললে গড়িয়ে মাটি ঘেঁষে যায়, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'শ্যূট' করা। অবশ্য

ব্যাটসম্যানদের হাতেও হকিস্টিকের মত ব্যাট, কাজেই গড়ানে বল আটকাতেও খুব অসুবিধা ছিল না। মুশকিলটা হত বল লাফিয়ে উঠলে। আরো মুশকিল, যদি ব্যাটসম্যানের একটু আগে বল পড়ে অর্থাৎ গুড লেংথ থেকে যদি বল লাফিয়ে ওঠে।

এই ধরণের অসুবিধা হয় দেখে বোলাররাও গুড লেংথ বল শুরু করে দিল। ব্যাটসম্যানরা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। কাস্তে নিয়ে ধান কাটার মত ডাইনে-বাঁয়ে ব্যাট চালাতেই তারা অভ্যস্ত, কিন্তু সেভাবে খেলে এই নতুন কায়দার বলকে আর ঠেকানো যাচ্ছেনা! ব্যাট করার নতুন কায়দাও তাহলে আবিষ্কার করতে হয়। জন স্মল হলেন নতুন ব্যাটিং পদ্ধতির আবিষ্কারকদের অন্যতম। সোজাবুদ্ধিতে তিনি বুঝে গেলেন ডাইনে-বাঁয়ে অর্থাৎ ক্রশব্যাটে খেললে আর চলবেনা বরং উপর-নীচে অর্থাৎ স্ট্রেট ব্যাটে খেললে কাজ হয়।

এভাবে খেলতে হলে হকিস্টিক প্যাটার্নের ব্যাটেও চলবেনা। ব্যাট নতুন কায়দায় তৈরী করতে হবে। বলেছি স্মল নিজে ব্যাট বানাতেন। ভেবে চিন্তে, একদম সিধে ব্লেডের ব্যাট তিনি বানালেন। সেই ব্যাটটিই হল এখনকার ক্রিকেট ব্যাটের আদিপুরুষ। এই নতুন ব্যাট নিয়ে স্মল দুর্ধর্ষ হয়ে পড়লেন। অফ ড্রাইভ কাকে বলে, তাই তিনি দেখাতে শুরু করলেন। তাঁর আর একটি মার ছিল, নামটি বললে এখন আর কেউ চিনবে না কারণ এ মার উঠে গেছে আধুনিক বোলিংয়ের চোটে। এর নাম ছিল 'ড্র'। ব্যাটসম্যানের পা আর স্টাম্পের মধ্য দিয়ে বল চলে যেত। এখনো হঠাৎ যদি ব্যাটে লেগে এইভাবে বল চলে যায়, তাহলে ঠাট্টা করে বলা হয় "হ্যারো ড্রাইভ" কিংবা "সারে কাট"।

স্মলের এই স্ট্রেট ব্যাট পদ্ধতির সবথেকে বড় অসুবিধা হল, রান বড্ড গড়িমসি করে ওঠে। আগেকার মত ধুমধড়াক্কা পেটানো যায় না। সুতরাং ব্যস্তবাগীশ যাঁরা, এই পদ্ধতিটা তাদের পছন্দ হল

না। এঁদেরই একজন হলেন টম স্যুটার। ইনি 'কাট' মার আবিষ্কার করলেন। কিন্তু এতেও খুব সুবিধা হল না, যেহেতু অফ স্টাম্পের বাইরের বল ছাড়া কাট মারা যায় না। অতএব ক্রীজ ছেড়ে তেড়ে বেরোলেন টম স্যুটার। যেখানে বল পড়ে সেখানেই তিনি লাফিয়ে যান। তাই দেখে প্রবীণরা তো শিউরে উঠলেন, সর্ব্বনাশ এ আবার কি খেলা! কালেকালে কতই যে দেখতে হবে। বৃদ্ধরা তুমুল কোলাহল তুললেন। ছেলে-ছোকরারা যথারীতি তাতে কান দিল না।

সে আমলে, গ্লাভস বা প্যাড যে কি বস্তু তা কেউই জানত না। মেষচারণ ক্ষেত্রে খেলার যা পরিণাম, তা ঘটত। হাত-পা কেটে রক্ত ঝরার দৃশ্য প্রতি খেলাতেই দেখতে হত। এহেন পরিবেশেও টম স্যুটার ফাস্ট বোলংয়ের বিরুদ্ধে উইকেট রক্ষা করতেন এবং স্টাম্প আউটও। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উইকেট রক্ষকের পিছনে লং স্টপ রাখতে হত। মাঠের সব ফিল্ডারের মধ্যে এর কাজটাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। লাম্পি স্টিভেন্সের বলে, বাইরান বাঁচাতে তিনজন লংস্টপও ব্যবহার করতে হয়েছিল।

সে সময়ের দুর্দান্ত বোলারদের অন্যতম ছিলেন ব্রেট। তার থেকেও মারাত্মক ছিলেন ডেভিড হ্যারিস। কুলর কাজ করতেন আর ক্রিকেট খেলতেন। ভীষণ জোরে বল করতেন, জন নাইরেনের কথায় : খাড়া হয়ে বল ছুঁড়ত, একটুও ঝুঁকত না। বল মাটি ছুঁয়েই লাফিয়ে উঠত। ফস্কালেই ব্যাটসম্যানের আঙুল ছেঁচে যেত।

হ্যারিস, লাম্পির থেকে জোর বল করতেন। মাটি থেকে বল লাফাত বলে, তার শিকাররা ক্যাচ আউটই হত বেশি। লাম্পি বোল্ড আউট করাটাই পছন্দ করতেন। এই দুই বোলারের আবির্ভাব ব্যাটসম্যানদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। আর চ্যালেঞ্জ এলেই টেকনিকেরও উন্নতি ঘটে। নতুন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যাঁরা নয়া পদ্ধতির বিকাশ ঘটান, উইলিয়ম বেল্ডহাম ছিলেন তাদের মধ্যে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চুল রূপালি ছিল বলে লোকে ডাকত, সিলভার বিলি। এর জন্ম ১৭৬৫-তে মৃত্যু ১৮৬৫তে। সাতানব্বুই বছর বেঁচেছিলেন। ক্রিকেটকে এমনই ভালবাসতেন ৮৬ বছর বয়সেও সাত মাইল হেঁটে ইংল্যাণ্ড বনাম গোডালমিঙ্গ দলের খেলা দেখতে গেছলেন।

যুবা বয়সে বেল্ডহাম ৫৪ মাইল ঘোড়ায় চেপে হ্যাম্বলডন ক্লাবে খেলতে আসতেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর, ১৭৮৬-১৮২১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ক্রিকেটের রাজচক্রবর্তী। প্রত্যেকটি বড় খেলায় এই ৩৫ বছর তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য অর্জন করেছেন। আক্রমণাত্মক ব্যাট করতেন। তাঁর মারের মধ্যে সেরা ছিল, কাট্ মার। বস্তুত, এই মার তাঁর হাতেই প্রথম ত্রুটিমুক্ত হয়।

বেল্ডহামের ঠিক উল্টোটি ছিলেন টম ওয়াকার। খাঁটি গ্রামবাসী। রোগা, হাড্ডিসার, ঢ্যাঙা লোক। শরীরে কয়েক ছটাকের বেশি মাংস ছিল না। আসল বয়সের থেকেও কুড়ি বছর বেশী দেখাত। হ্যারিসের বলে বহুবার তার হাত ছেঁচে গেছে কিন্তু রক্ত বেরোয় নি। রান নেবার জন্য দৌড়তে হলেই ওয়াকরের গায়ে যেন জ্বর দেখা দিত। নোহা মান নামে একজন হ্যাম্বলডন ক্লাবে খেলতে আসতেন সাসেক্স থেকে। ওয়াকার এবং মান একসঙ্গে ব্যাট করছেন। চারটে রান নেবার জন্য দুজন দৌড়চ্ছেন। কিন্তু ওয়াকার এমনি ঢিমে-তালে ছুটছেন যে মান ওকে অতিক্রম করে গিয়ে, পিঠ চাপড়ে বলেন, "ওয়াকার নামটা বেশ মানিয়ে গেছে, কদাচ রানার নয়।"

দৌড়বার মতই ওয়াকারের রান সংগ্রহের হারটিও ছিল বিরক্তিকর। তাকে আউট করাও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। খেলার অবস্থা যাই হোকনা কেন, ওয়াকার নির্বিকার চিত্তে, ধীর মস্তিষ্কে খেলে যেতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকতেন। মেরিলীবোন মাঠে ওয়াকার রেভারেণ্ড লর্ড ফ্রেডেরিক বো-ক্লার্কের বল খেলছিলেন। প্রথম ওভারের সব ক'টি

বলই (তখন চার বলে ওভার হত) চমৎকার লেংথে পড়ল, আর ওয়াকারের নির্বিকার ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে স্থানুবৎ মাটিতে পড়ল। ক্ষেপে গিয়ে রেভারেণ্ড মাটিতে টুপি ছুঁড়ে টমের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, "আ মোলো যা, ঘাগী জানোয়ার কোথাকার।" তাই শুনে টম মন্তব্য করেন, "যা খুশি বলুক, কেয়ার করি না।" এবং আবার খুটুশ খুটুশ করে ব্যাট করা শুরু করেন। ডেভিড হ্যারিস একবার ওয়াকারের বিরুদ্ধে ১৭০টি বল করেছিলেন, মাত্র একটি রান দিয়ে।

যত গড়িমসি ভাব ওয়াকারের মধ্যে থাকুক না কেন, নতুন কিছু করার জন্য ওর মাথাটা সব সময়ই ব্যস্ত থাকত। আজ আমরা যে স্লো বোলিং দেখছি, তার উদ্ভাবক কিন্তু এই টম ওয়াকার। নতুন জিনিস হলেই যা হয়, রৈ রৈ কাণ্ড শুরু হল। ১৭৯২ সালে অল ইংল্যাণ্ড যখন কেণ্টের বিরুদ্ধে খেলে, তাতে টম প্রথম স্লো বল করেন। বেল্ডহাম তো মরমে মরে গেলেন এই "বেবী বোলিং" দেখে। শেষমেশ দেখা গেল হ্যারিসের বিদ্যুৎগতি বলের থেকে টমের এই তোল্লাই বলেই বেশি উইকেট পড়ল। এই কায়দার বল করার নাম হল "লব বোলিং"।

বলেছি, নতুন নতুন ব্যাপারে টমের মাথা খাটত। এর আগে সে খুব জোরে বল করার একটা কায়দা বের করেছিল, কিন্তু হ্যাম্বলডন খেলোয়াড়দের এক কমিটি তা 'আনফেয়ার' বলে বাতিল করে দেয়। কায়দটা রাউণ্ডহ্যাণ্ড বোলিংয়ের মত ছিল।

টেকনিকের নানাবিধ পরীক্ষা ও উন্নতি ঘটাবার জন্যই, ক্রিকেটের ইতিহাসে হ্যাম্বলডন ক্লাব চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ক্রিকেটের টেকনিকই নয়, আইনেরও উন্নতি ঘটায় হ্যাম্বলডন ক্লাব। ১৭৭৬-এ তৃতীয় স্টাম্প ব্যবহার শুরু হয় বোলারকে উৎসাহ দিতে। এল বি ডবল্যু আইনও এই সময় চালু হয়। আগে পা দিয়ে উইকেট আড়ালের চেষ্টা বিশেষ ছিল না, কিন্তু উইকেট উঁচু এবং চওড়া হওয়ায় এই প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে এল বি ডবল্যু

আইন দেখা দেয়। হ্যাম্বলডনের 'শক' হোয়াইট, স্টাম্পের সমান উঁচু এবং চওড়া ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছিল। ফলে আইন হল ব্যাট ৪$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বেশী চওড়া হতে পারবে না। বলের ওজনও এই সময় নির্দিষ্ট করা হয়। সেই ওজন এখনও মান্য হচ্ছে। এখন যে বল খেলা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই বলই খেলা হত।

লণ্ডনের "স্টার অ্যাণ্ড গার্টার ইন"-এ ১৭৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ভদ্রলোকদের এক কমিটির বৈঠকে ক্রিকেটের যথোপযুক্ত আইনকানুন রচিত হয়। এদের মধ্যে হ্যাম্বলডন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড পাউলেটও ছিলেন। গ্রাম থেকে ক্রিকেট লণ্ডনে শহুরে বাবুদের দরবারে চলে আসে। ফলে হ্যাম্বলডন ক্লাবেরও মৃত্যু ঘটে। ১৭৮৬-র পর এই ক্লাব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ক্লাবের খেলোয়াড়রা অন্যান্য কাউণ্টিতে চলে যান।

॥ চার ॥

লণ্ডনের কিছু ভদ্রলোক মিলে ১৭৮৫ সালে একটি ক্রিকেট ক্লাব পত্তন করেন। মাঠের নামে ক্লাবের নাম হোয়াইট কণ্ডুইট ক্লাব, মাঠের সংলগ্ন সরাইওলা ছিল মাঠের মালিক। মাঠ সম্পর্কে ভদ্রলোকদের একটা বড় অসুবিধা হল, আবরু বলে কিছু নেই। পাঁচজনের চোখের সামনেই সব কিছু করতে হয়। তাছাড়া পরিবেশটাও খুব সুবিধার নয়।

গ্রাউণ্ড-বোলার হিসাবে টমাস লর্ড নামে এক পেশাদারকে ভদ্রলোকরা নিয়োগ করেন। লোকটি খুবই অমায়িক, কিন্তু হিসাবী বুদ্ধিতে অতি সরেশ। লর্ড উইঞ্চিলসী এবং লর্ড লেনক্সের কাছ থেকে টাকা নিয়ে টমাস লর্ড লণ্ডনের বাইরে একটা মাঠ ভাড়া নিল। এখনকার বেকার স্ট্রীট স্টেশনের কাছে ডরসেট স্কোয়্যার

হল সেই মাঠ। ১৭৮৭-র ৩১ মে মিডলসেক্স বনাম এসেক্সের খেলা দিয়ে মাঠের উদ্বোধন হয়। তখনকার দিনে ক্রিকেট মহলে এই দুই কাউন্টি মোটেই পাত্তা পেতনা।

সে বছর হোয়াইট কণ্ডুইট ক্লাব লর্ডের এই নতুন মাঠেই খেলে। বছরের শেষে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব নামে সদ্য তৈরী এক ক্লাবের সঙ্গে এরা মিলে যায়। ১৭৮৮-এ ক্রিকেটের আইনগুলি এই নতুন ক্লাব সংশোধিত করে, ১৮০০ সালের আগে আরো দুবার আইনগুলি পরিমার্জিত হয়। সেই থেকে অদ্যাবধি ক্রিকেট জগতের একচ্ছত্র শাসক হয়ে আছে এই এম সি সি।

ইতিমধ্যে লণ্ডন শহর বড় হতে শুরু করে দিয়েছে। জমির দাম বাড়ছে। লর্ড লীজ নিয়েছিল মাঠটি। ১৮১০ সালে তার মেয়াদ ফুরোবে। নতুন করে লীজ নিতে হলে অসম্ভব ভাড়া দিতে হবে। হিসেবী বুদ্ধিতে পোক্ত লর্ড ১৮০৯ সালেই সেণ্ট জন উডে একটা জমি ভাড়া করে পরের বছর পাততাড়ি গুটিয়ে নতুন মাঠে চলে এল। এম সি সি-র সভ্যদের কাছে এই নতুন মাঠ খুব ভাল লাগেনি। তারা তিনটির বেশী ম্যাচ এখানে খেলেনি। বিপদে পড়ল লর্ড। এম সি সি খেলা বন্ধ করলে তাঁর রোজগারও বন্ধ। উদ্ধার পেল যখন রিজেণ্ট খালটি তার মাঠের উপর দিয়ে কাটা হবে বলে সরকার ঘোষণা করল।

লর্ড আবার পাততাড়ি গুটিয়ে তৃতীয় মাঠে উঠে এল। এখনকার লর্ডস মাঠ হল সেই মাঠ। উঁচু বেড়া দিল আবরু রক্ষার্থে, প্যাভিলিয়ান তৈরী করল। আর একটি ট্যাভার্নও। এগার বছর পর প্যাভিলিয়নটি পুড়ে যায়, সেই সঙ্গে বহু পুরনো ক্রিকেট রেকর্ড (হ্যাম্বলডন ক্লাবেরও) ভস্মীভূত হয়। এই মাঠে প্রথম খেলা শুরু হয় ১৮১৪ সালে।

লর্ডের টাকার লোভ ছিল অসম্ভব। মাঠের বাইরে যে বল মেরে পাঠাতে পারবে তাঁকে ২০ গিনি পুরস্কার দেবে ঘোষণা করে। ই এইচ,

বাড বল পাঠাল কিন্তু টাকা দিতে লর্ড রাজী হল না। জমির দাম বাড়ছে, লর্ড ঠিক করল খণ্ড খণ্ড প্লট করে মাঠটাকে বিক্রি করবে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টর উইলিয়ম ওয়ার্ড তাই শুনে ১৮২৫-এ লর্ডের কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডে মাঠটি কিনে নেন। ১৮৬৬ সালে এম সি সি ১৮,৩৩৩ পাউণ্ডে মাঠটি কিনে নেয়। মাঠটি আর একবার হাত-ছাড়ার উপক্রম হয় ১৮৮৮ সালে। মাঠের উপর দিয়ে রেল-লাইন যাবে সাব্যস্ত হয়। ক্রিকেটাররা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে তখন তুমুল কাণ্ড ঘটে যায়। শেষে ঠিক হয় প্র্যাকটিশ গ্রাউণ্ড অর্থাৎ যাকে নার্সারি বলা হয় তার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটা হবে। লর্ডস মাঠের এই নার্সারি নামটা সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা, তরুণ খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিয়ে লালন করা হয় বলেই এই নাম। তা নয়, ১৮৮৭ পর্যন্ত এখানে একটা নার্সারি বাগান ছিল।

বড় ক্রিকেটারদের সকলেই শুরু থেকে লর্ডসে খেলতে এসেছেন। হ্যাম্বলডন ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড়রা বিভিন্ন কাউন্টির পক্ষে খেলে এই মাঠে নানান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এম সি সি-র পক্ষে খেলে ডরসেট স্কোয়্যার মাঠে টম ওয়াকার প্রথম সেঞ্চুরী করেন ১৭৯২ সালে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে। এই খেলাতে বেল্ডহামও ১৪৪ রান করেছিলেন। ১৭৮৯তে ডরসেট স্কোয়্যারে হ্যাম্বলডনের শেষ খেলায় বেল্ডহাম ৯৪ রান করেন। ১৮১৭-য় ল্যাম্বার্ট নামে এক পেশাদার লর্ডস মাঠে এবং ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম, একটি খেলার উভয় ইনিংসে শত রান করেন, সাসেক্সের পক্ষে এপ্‌সনের বিরুদ্ধে ১০৭ নট আউট এবং ১৫৭ রান। লর্ডস মাঠে এর ৭৬ বছর পরে স্টোডার্ট ১৮৯৩ সালে এই কৃতিত্ব দেখান।

ভদ্রলোক ক্রিকেটারদের মধ্যে দুজনের নাম করতেই হয়। স্কুইর ওসবাল্ডেস্টন এবং লর্ড ফ্রেডেরিক। স্কুইরের ক্রিকেট জীবন

খুবই হ্রস্ব। ১৮১৮ সালে লর্ডসে একটি ম্যাচে হেরে রাগের মাথায় এম সি সি সভ্যপদ ত্যাগ করেন। পরে ফিরে আসতে চাইলেও তাকে আর নেওয়া হয় নি।

রেভারেণ্ড লর্ড ফ্রেডেরিক বোক্লার্ক ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করলেও ৩৫ বছর ধরে ক্রিকেট খেলেছেন। ইনি মারা যান ১৮৫০-এ। ১৮২৭-এ ৫৪ বছর বয়সে ইনি ৭৮ রান করেন তখনকার ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে। তবে খাঁটি স্পোর্টসম্যান এঁকে বলা যায় না। প্রকাশ্যেই তিনি স্বীকার করেন, তার অধীন ম্যাচগুলির উপর বাজী ধরে তিনি বছরে ৬০০ গিনি রোজগার করতেন।

ক্রিকেট নিয়ে জুয়া খেলা তখন দুষ্ট প্রভাব ছড়ায়। শুধু ভদ্রলোকরাই নয়, লর্ডস মাঠের প্যাভিলিয়ানের সামনে সারি বেঁধে জুয়াড়ীরা অপেক্ষা করত। সব রকমের বাজিই তারা ধরত। এঁদের নাম ছিল 'ব্ল্যাকলেগস'। পেশাদারদের ঘুষ দিয়ে এরা ম্যাচের হারজিত ঠিক করত। সিলভার বিলি বেল্ডহামের মত অতবড় খেলোয়াড়ও বৃদ্ধ বয়সে স্বীকার করেন, ঘুষ নিয়ে নটিংহামের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ তিনি বিক্রি করেছিলেন।

১৮১৭-য় লর্ডসে দুজন জুয়াড়ীর মধ্যে ঝগড়া মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। উভয়ের গালাগালির মধ্য দিয়ে বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। এর ফলে ল্যাম্বার্টের মত অতবড় খেলোয়াড় সারাজীবনের জন্য ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হন। ইংল্যাণ্ড বনাম নটিংহামের ম্যাচটি তিনি বিক্রি করেছিলেন।

ক্রিকেট যত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, জুয়া খেলার সমস্যাটাও কমতে শুরু করে। আগে বড় খেলোয়াড় দু-চারজনের বেশি ছিল না। তাদের উপরেই খেলার হারজিত নির্ভর করত। সুতরাং ঘুষ দিতে মোটেই অসুবিধা হত না। কিন্তু ক্রিকেট জনপ্রিয় হওয়ার ফলে নতুন বহু ভাল খেলোয়াড় দেখা দিতে থাকল। একটা গোটা

দলকে ঘুষ দিয়ে কিনে ফেলা, জুয়াড়ীদের সাধ্যে আর কুলোল না। ক্রিকেট নিয়ে জুয়া খেলা ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

দুইটির বদলে তিনটি স্টাম্প প্রবর্তন এবং ক্রিকেট ব্যাটের প্রস্থ নির্দিষ্ট করে দেবার পর, আর যে ব্যাপারটি ক্রিকেটের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়, তা হল "রাউণ্ড-আর্ম" বোলিং। এজন্য বোলারদের প্রায় ষাট বছর ধরে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতি খেলাতেই রানের বান ডাকত। টম ওয়াকার যে তোল্লাই বল চালু করেছিলেন, তখন সেটা সব বোলারই প্রায় ব্যবহার করতেন। ব্যাটসম্যানরাও বুঝে গেলেন এ বল লাফিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খেলতে হবে। বোলাররা সুবিধা করে উঠতে না পেরে, অন্যভাবে বল করার চিন্তা শুরু করলেন।

বলেছি, টম ওয়াকার একবার নতুন কায়দার বল করার জন্যে হ্যাম্বলডন কমিটির কাছ থেকে ধমক খেয়েছিলেন। এই কায়দাটিই আবার চালু করার চেষ্টা এই সময় শুরু হল। 'রাউণ্ড-আর্ম' বল প্রবর্তনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় কেন্টের জন উইলেস নামে এক অপেশাদারকে। ক্রিকেটে বিপ্লব আনল যে ব্যাপারটি, সেটি উইলেসের মাথায় প্রথম আসে তাঁর ছোট বোনের দৌলতে। উইলেস ব্যাট করতেন, বল করত বোন। ফ্রকের ঘাঘরার হাত আটকে যায়। তাই সে হাতটা পাশের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে কাঁধ সমান তুলে দাদাকে বল করত।

উইলেস ১৮০৭ সালে জেণ্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্সের প্রথম খেলায় কাঁধ-সমান হাত তুলে বল করেন। একটিমাত্র উইকেট পান। ১৮০৭ সালে কেণ্ট ত্রয়োদশের পক্ষে ইংল্যাণ্ড ত্রয়োদশের বিরুদ্ধে

তিনি এই কায়দার বল করেন। ব্যাটসম্যানরা ভীষণ বেকায়দা বোধ করে। এরপর উইলেস যেখানে যখনই খেলতে নামেন মাঠের আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে। 'বডি লাইন' সিরিজের মত অবস্থা। এমনও হয়েছে দর্শকরা মাঠে ঢুকে স্টাম্প তুলে ফেলে খেলা বন্ধ করে দিয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও উইলেস গোঁ ছাড়েননি। পর পর পনেরো বছর নাগাড়ে তিনি এইভাবে বল করে গেছেন। নাগাড়ে এই পনেরো বছর তিনি গালিগালাজ, বিদ্রুপ সহ্য করেছেন। অবশেষে ১৮২২ সালে লর্ডস মাঠে কেন্ট বনাম এম সি সির খেলায় তাঁর বলে একাদিক্রমে নো-বল ডাকায় বিরক্ত হয়ে তিনি বল ছুঁড়ে ফেলে, মাঠ থেকে সোজা বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে তিনি রয়ে গেলেন।

উইলেস বিদায় নিলেও স্বাধীনতার যে স্বাদটুকু তিনি দিয়ে গেলেন, বোলাররা তা ভুলতে পারল না! সাসেক্সের উইলিয়াম লিলিহোয়াইট এবং ব্রডব্রিজ মারাত্মক রাউণ্ড-আর্ম বোলার হয়ে উঠলেন। ১৮৩৭-এ অল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি খেলার প্রথম দুটিতে সাসেক্স জয়ী হয়। ইংল্যাণ্ডের পেশাদাররা এক ঘোষণায় স্বাক্ষর দিয়ে জানায় সাসেক্সের বোলাররা যদি ভদ্রভাবে বল না করে তা হলে তৃতীয় ম্যাচ খেলবে না। যাই হোক, খেলা হয় শেষ পর্যন্ত। ইংল্যাণ্ডের এক অপেশাদার বোলার রাউণ্ড-আর্ম বল করে ২৪ রানে সাসেক্সকে হারিয়ে দিতে সাহায্য করে।

রাউণ্ড-আর্ম বল সংক্রান্ত ব্যাপারে এম সি সি কমিটি নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে দুর্বলতার পরিচয় দেয়। প্রায় একুশ বছর অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে চলার পর ১৮২৮-এ চাপে পড়ে তারা দশ নম্বর আইনটির পরিবর্তন ঘটান। বোলাররা আড়াআড়িভাবে কনুই পর্যন্ত তুলে হাত ঘোরাতে পারবে, এই অনুমতিটুকু তারা দেন। কিন্তু বোলাররা আগের মতই কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে বল করতে লাগলেন,

আইনকে পরোয়া না করে। আরো সাত বছর কাটল এইভাবে। এম সি সি আবার আইন পালটে বলল, হাত কাঁধসমান আড়াআড়ি তোলা যাবে, তবে তার বেশি হাত তুলে কিংবা ঝাঁকিয়ে বা ছুঁড়ে বল করা চলবে না। কিন্তু বোলারদের সাহস বেড়ে গেছে। ফলে হাতটা কাঁধের থেকেও ক্রমশ উপরে উঠতে শুরু করল।

এখন যে ধরনের ফাস্ট বোলিং আমরা দেখি, তার শুরু এই আমলেই। পটাপট পেস বোলার গজিয়ে উঠতে লাগল। ১৮৩৫ থেকে '৪৫ পর্যন্ত এই দশ বছর ব্যাটসম্যানরা বিব্রত হয়ে শুধু দেখল একটু একটু করে রাউণ্ড-আর্ম বোলিং কিভাবে ওভার-আর্ম বোলিং-এ রূপান্তরিত হল। আশ্চর্যের কথা, অধিকাংশ আম্পায়ারই এই এই ব্যাপারে চোখ ফিরিয়ে থাকলেন।

১৮৫৪-এ সচকিত এম সি সি কড়া হবার চেষ্টা করল, কিন্তু পাত্তা পেল না। ১৮৬২-র ২৭শে আগস্ট অর্থাৎ জন উইলেস শুরু করার ৫৬ বছর পর, ওভালে সারের বিপক্ষে অল ইংল্যাণ্ড দলের এডগার উইলশার নামে এক ল্যাটা ফাস্ট বোলারকে আম্পায়ার জন লিলিহোয়াইট (উইলিয়মের পুত্র) পরপর ছয়বার নো-বল ডাকলেন। বল ফেলে দিয়ে দুজন আপেশাদারবাদে বাকি পেশাদারদের নিয়ে উইলশার মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিনকার মত খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন লিলিহোয়াইটের বদলে অন্য আম্পায়ার দিয়ে নির্বিঘ্নে খেলা সম্পন্ন হয়। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যাটিকে আর পাশ কাটান গেল না। নানাবিধ সংশোধন করে শেষে ১৮৬৪-তে আজকের এই মাথার উপর হাত তুলে বল করার অনুমতি এম সি সি দিল।

জন লিলিহোয়াইট যে পর পর ছ'টি নোবল ডেকে একটা কাণ্ড বাধান সেটা তার পূর্ব্বকল্পিত ব্যাপার ছিল। বরাবরই তিনি বোলারদের পক্ষের লোক। মাথার উপর হাত তুলে বল করাকে আইনসিদ্ধ করতে এম সি সি-র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বেছে বেছে তিনি এই

গুরুত্বপূর্ণ খেলাটিতেই একটা গোলমাল বাধান। এতে সবাই অবাক হয় এই কারণে যে উইলশারের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রাউণ্ড আর্ম বোলিংয়ের শ্রেষ্ঠ বোলারদের অন্যতম উইলিয়ম লিলিহোয়াইটের পুত্র হয়ে জন কিনা এভাবে নো-বল ডাকল! যেজন্য নো-বল ডাকা তা কিন্তু সিদ্ধ হয়েছিল।

রাউণ্ড-আর্ম বোলিংয়ের প্রয়োগ দিন দিন বেড়েই চলতে লাগল। আর ব্যাটিং পদ্ধতিও সেই সঙ্গে তাল রেখে আরও উন্নত হয়ে উঠল। তোল্লাই বলে খেলাটা সহজ ছিল, কিন্তু এবারে আত্মরক্ষার জন্য কলাকৌশল আবিষ্কার এবং মারের গঠন প্রকৃতির রদবদল ঘটাতে হল। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্যাটিং আরো বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠল।

ক্রিকেটের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবলে, ওয়াকার, উইলেস, লিলিহোয়াইট পিতাপুত্র এবং উইলশারের আপ্রাণ চেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। একটি কথা কিন্তু কোনক্রমেই ভোলা উচিত নয়, এ সবেরই মূলে আছে একটি মেয়ে।

রাউণ্ড-আর্ম বোলিংয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনপ্রিয় বোলার ছিলেন কেন্টের আলফ্রেড মিন—আলফ্রেড দি গ্রেট, দি লায়ন অব কেন্ট। ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বায়, ওজনে সাড়ে তিন মণ। তাঁর সময়ে তাঁর মত ফাস্ট বোলার আর কেউই ছিলেন না। ১৮৩৬-এ লেস্টারে, উত্তর বনাম দক্ষিণের ৫০০ পাউণ্ড বাজির খেলায় (তখনও ক্রিকেটে জুয়া ছিল) ব্যাট করার সময় মিন ক্রমান্বয়ে বলের আঘাত পান। অবশেষে ১৪৬ রানে অবসর নিতে বাধ্য হন। আঘাতে এবং যন্ত্রণায় তিনি বসতে পর্যন্ত পারছিলেন না। ঘোড়ার গাড়ির ছাদে তাকে শুইয়ে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে পড়ে না যান। সেই অবস্থায় লেস্টার থেকে তাঁকে লণ্ডনে আনা হয়। আঘাত দেখে ডাক্তাররা প্রথমে বলেন, পা কাটতে হবে। ক্রিকেটের সৌভাগ্য এক্ষেত্রে ডাক্তারদের শাস্ত্রজ্ঞানে মিন কর্ণপাত করেননি। আপনিই সেরে ওঠেন।

১৮৬১-তে আলফ্রেড মিন মারা যান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিকেটের আদিকালও শেষ হয়ে যায়। কেননা ১৮৬০-র ১৮ই জুলাই ডাউন এণ্ডের ডাক্তারবাবুর চতুর্থ পুত্র উইলিয়ম, তার দ্বাদশ জন্মদিনে ক্লিফটনের বিরুদ্ধে ৫০ রান করে ইতিমধ্যে ক্রিকেটের আরএক যুগের সূচনা করে। তার নাম হয় স্বর্ণ-যুগ বা গ্রেসের যুগ। সে আর এক কাহিনী।
